

চাষ ও কারুকলা

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

চারু ও কারুকলা

নবম-দশম শ্রেণি

রচনায়

হাশেম খান

এভলিন মালাকার

এ.এস.এম. আতিকুল ইসলাম

সন্জীব দাস

সম্পাদনায়

মুস্তাফা মনোয়ার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর - ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
সুদর্শন বাহার
সুজাউল আবেদীন

প্রব্ধ ও চিত্রাঙ্কনে
হাশেম খান
এডগিন মাপ্পাকার
এ.এস.এম. আতিকুল ইসলাম
সন্জীব দাস
সুদর্শন বাহার
সুজাউল আবেদীন

কম্পিউটার এডিটিং এন্ড মেকাপ
পারফর্ম কলার গ্রাফিক্স (প্রাঃ) গিঃ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মূল্য :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর হৃত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ত্রুতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অগ্রনির্বিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে জর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিবনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য, সত্বকৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-কর্ম-গোয় ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের যুগকর্ম-২০২১ এর দক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিবনফল হুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইজিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

প্রকৃতিকে খির ও সুশৃঙ্খলভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাকে মানসিক, নৈতিক ও নান্দনিক দৃষ্টিতে তুলে ধরতে চাই ও কারুক্ষা বিষয়টি শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীদের শিল্পবোধ ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধ তৈরির ক্ষেত্রে চাই ও শিল্পকলা বিষয়টি অতি জরুরি। এই বিষয়টি পাঠদানের জন্য তাই ব্যবহারিক ও হাতে কলামে কাজের গুণের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আশা করি নবম-দশম শ্রেণির চাই ও কারুক্ষা পাঠ্যপুস্তকে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অসীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আত্মরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	শিল্পকলা	১-১০
দ্বিতীয়	দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও শিল্পকর্ম	১১-৩১
তৃতীয়	বাঙালি লোকজীবনে চারু ও কারুকলা	৩২-৪১
চতুর্থ	জীবনে হলে জ্ঞানে হলে	৪২-৫৫
পঞ্চম	ব্যবহারিক শিল্পকলা	৫৬-৭৩
ষষ্ঠ	বাস্তব ও স্মৃতি থেকে অনুশীলন	৭৪-৭৯
সপ্তম	কারুকলা	৮০-১১২
	রঙিন ছবি	১১৩-১২০

প্রথম অধ্যায় শিল্পকলা



আদিম পুহাবাসী মানুষের হাত ধরেই শিল্পকলার যাত্রা শুরু

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা—

- শিল্পকলার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিল্পকলার অন্যতম মাধ্যম চারু ও কারুকলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

ফর্ম-১, চারু ও কারুকলা-৯ম-১০ম

পাঠ : ১

শিল্পকলা

শিল্পকলা সন্দর্শকে ইতিপূর্বে অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা ধারণা পেয়েছ। শিল্পকলা বিষয়ে কিছু জানতে হলে প্রথমে এর উৎপত্তি বিষয়ে জানতে হবে। অর্থাৎ যখন থেকে গৃহাবাসী মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম গড়ে তোলে তখন থেকেই শিল্পকলার যাত্রা শুরু। প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বিশালতা মানুষের মনে এক রহস্যময় অনুভূতির জন্ম দেয়। আদিম শিকারি মানুষ সে সব রহস্যের কুলকিনারা করতে না পেরে বিভিন্ন জাদু বিশ্বাসে নির্ভরতা খুঁজেছে। সহজে পশু শিকার করার আশায় সেই জাদু বিশ্বাস থেকেই গৃহ্যর দেয়ালে ধারালো পাখর বা পশুর হাড় দিয়ে খোদাই করে ঐকেকে পশু শিকারের বা পশুর নানারকম ছবি। এ ছবিগুলোই পৃথিবীর প্রথম শিল্পকলা।

এরপর সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে তার আয়ত্রে এনে নিজের জীবনযাপনকে অনেক সহজ, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করেছে। এভাবে যখন মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অনেক সহজ হলো তখন তার মনের কিছু কিছু অনুভূতি ও কল্পনা শক্তি একত্রিত হয়ে শিল্পিত রূপ নিল। যেমন ভাষা আবিষ্কারের সাথে সাথে কবিতা, গল্প এসেছে। পরে উদ্ভব হয়েছে সঙ্গীতের।

এই যে মানুষের মনের কল্পনা ও সৃজনশীলতার মিশ্রণে বা তৈরি হলো- ছবি, কবিতা, গান এ সবকে আমরা নাম দিয়েছি শিল্পকলা।

এক কথায় ক্যা যায়, মানুষের মনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক রূপ হচ্ছে শিল্পকলা।

কাজ : জাদু বিশ্বাসই পৃথিবীতে আদিম গৃহাবাসী মানুষদের শিল্পকলার সূচনা করে। এই স্বত্বব্যবস্থার স্বপক্ষে তোমরা খাতায় ১০টি বাক্য লেখ।

পাঠ : ২

শিল্পকলার শ্রেণিবিভাগ

সামগ্রিক শিল্পকলা আসলে অনেক শাখা প্রপাখায় বিভক্ত। বহু তার মাধ্যম। আমাদের কাছে বিষয়ের ব্যাপার এই যে, শিল্পকলার প্রায় সকল মাধ্যমেইই শুরু করেছিল আদিম শিকারি মানুষেরা। বিষয়বস্তু দক্ষতার সাথে প্রাচীন যুগের 'হোমোস্যাপিয়েন' মানুষ ঐকেকে বিভিন্ন ক্যাপশুর ছবি। তারা অত্যন্ত পর্যবেক্ষণশীল ছিল। জীবজন্তু সন্দর্শকে চমৎকার জ্ঞান তাদের ছিল এবং পাথর কিংবা হাড়ের উপর নির্ভুল সূঁই রেখা অঙ্কন করে তা ফুটিয়ে তুলতে পারত। তাদের আঁকা ছবি দেখে প্রতিটি কন্ডুকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এমন চিত্র আছে যেখানে জীবজন্তুর আকারে অঙ্কনরত মানুষের ছবিও আছে। মাথার উপর শিং এবং পিছনে লেজ পরিহিত মানুষের ছবি আছে। হরিণের সাথে সজ্জিত মানুষটি হরিণের অঙ্গভঙ্গি নকল করে দুপা উপরে তুলে লাফ দিচ্ছে। তাদের আঁকা ছবি থেকেই জানা যায় যে, আদিম মানুষ শিকার করা পশুকে সামনে রেখে তার চারপাশ ঘিরে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও চিৎকার করে লাফাতে লাফাতে আনন্দ প্রকাশ করত। সেখান থেকেই মানুষের নৃত্য-গীতির শুরু। শিকার করা বন্যপশুর গোমশ চামড়া, শিং, ইত্যাদি পরিধান করে তারা এ পশুর অনুকরণ করে হাঁটা, লাফানো, দৌড়ানো ইত্যাদির অভিনয় করত। ধারণা করা হয় পশুর পালাকে বোঁকা দিয়ে

তাদের সাথে মিশে থেকে সহজে শিকার করার কৌশল হিসেবে তারা এসব করত। সেখান থেকেই মানুষের অভিনয় শিল্পের শুরু। যদিও আদিম মানুষ এ সবই করেছে তাদের বাচনর ভাগিনে, বাদ্য সজ্জার প্রয়োজনে।

কাজ : পুংর দেহেরে আদিম মানুষের আঁকা পশুর ছবিগুলোর আকৃতি ও অলংকার অনেক নির্ভুল মিশ। কী কারণে তারা এত নির্ভুলভাবে জীবজন্তুর ছবি আঁকতে পারত বসে ছুঁমি মনে কর, তা খাতার লেখ।

পার্শ্ব : ৩

শুরু ছবি আঁকা নয়, প্রস্তর যুগের মানুষ মূর্তিও তৈরি করত। যাকে কলা হয় ভাস্কর্য। সে সব ভাস্কর্যের বেশিরভাগই ছিল মানুষের মূর্তি এবং প্রায় সবই নারীমূর্তি। আদিম সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মেয়েরাই ছিল দলের প্রধান। যাকে মনে করা যেতো দলের আদি সত্ত্বা। অর্থাৎ তার থেকেই দলের উদ্ভব হয়েছে। তাই মাতৃসম্মার প্রতীক হিসেবে তারা এসব নারীমূর্তি তৈরি করেছিল। কখনো পাথরের গায়ে আঁচড় কেটে আবার কখনো অলাদা পাথর কেটে তারা এগুলো তৈরি করত। এছাড়া বাইসনের শিং, পশুর হাড় কিংবা পাথর প্রভৃতি দিয়ে পশু-পাখির মূর্তিও তারা তৈরি করত। নানারকম মৃৎপাত্র অর্থাৎ মাটির তৈরি পাত্র তারা তৈরি করত এবং বিভিন্ন রকম হাতিয়ার তৈরি করে তাতে নানারকম কলঙ্ক করত। এমনকি মাছের মেথলভের হাড়, খিনুক ও হরিণের দাঁত দিয়ে পয়না বানিয়ে তা ব্যবহার করত আদিম মানুষ। অর্থাৎ কারুশিল্পের সূচনাও তারা করেছিল। পশুর হাড়, চামড়া, ফল, ঝাড়ু, পাথর কিংবা কাগজটি দিয়ে শুরু হয় ঘরবাড়ি তৈরির প্রথম প্রচেষ্টা। সেখান থেকেই স্থাপত্যকলার শুরু। এভাবে মানুষের অর্জিত ও চর্চিত শিল্পকলার প্রায় সকল শাখার সূত্রপাত আদিম মানুষের হাতেই ঘটেছিল, যেমন- ভিত্তিকলা, কারুশিল্প, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, সূতা, সজীবিত, পতিলের এ রকম অনেক শিল্প মাধ্যম।



নারীমূর্তি যা মাতৃসম্মা
ও উর্বরতার প্রতীক

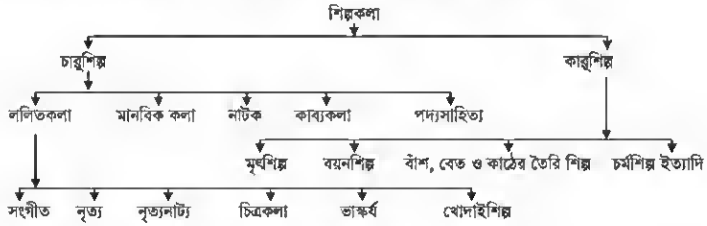
কাজ : পুরো শ্রেণির শিকারীরা ৫/৬ জনের এক একটি দলে ভাগ হয়ে প্রতিদল নিজেদের মধ্যে আপোচনর মাধ্যমে খাতার নিত্যর বাক্যটির মাধ্যমে লেখ।

আলকের শিল্পকলার প্রায় সকল শাখার সূচনা আদিম মানুষের হাতে।

পার্শ্ব : ৪

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা জেনেছি যে, সমগ্র শিল্পকলা মূলত প্রধান দুটি শাখার বিভক্ত। একটি হচ্ছে চিত্রশিল্প বা Fine Arts এবং অন্যটি হচ্ছে কারুশিল্প বা Crafts. চিত্রশিল্প বলতে আমরা সে সব শিল্পকেই বুঝি যা মানুষের সৃজনশীল মনের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ সৃষ্টির আনন্দে মনের ভাগিনেই তার উৎপত্তি। আমাদের দুটি ও মনকে আনন্দ দেয় তাই তার উদ্দেশ্য। মানুষের মনের নানা অনুভূতি, সুখ, দুঃখ, আশঙ্কা, বেদনা এবং অন্তর নানামুখী অনুভব থেকে চিত্রশিল্প সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে কারুশিল্প তৈরি হয়, মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন মাধ্যম রেখে। অর্থাৎ কারুশিল্প যদিও শিল্প তথাপি তা কেবল মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য বা দৃষ্টিকে আনন্দ দেবার জন্য তৈরি হয় না, এ শিল্প মানুষের ব্যবহারিক কাজে প্রয়োজন হয়। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা কারুশিল্পের ব্যবহার করি। তবে মানুষের সৃষ্ট সবক প্রকার শ্রেষ্ঠ শিল্পই চারুশিল্পের অন্তর্গত। নিচে একটি ছকের সাহায্যে শিল্পকলার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো:



কাজ : ক্রাসের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে ললিতকলার বিভিন্ন শাখাগুলোতে বাংলাদেশের তিনজন করে বিশিষ্ট শিল্পীর নাম লেখ। দেখা যাক কোন দল সবগুলো শাখার শিল্পীদের নাম লিখতে পারে।

পৃষ্ঠ : ৫

বর্ণিত ছকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিল্পকলাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- (১) চারুশিল্প (২) কারুশিল্প।

চারুশিল্পকে আবার ললিতকলা, মানবিক কলা, নাটক, কাব্যসাহিত্য ও পদ্যসাহিত্যে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ললিতকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগ। এই ভাগের কয়েকটি শাখা আছে। যেমন- চিত্রকলা, ভাস্কর্য, খোদাইশিল্প, সংগীত, নৃত্য ও নৃত্যনাট্য।

অন্যদিকে শিল্পকলার অপর ধারা কারুশিল্পের শাখাগুলো হচ্ছে- মূর্শশিল্প, বয়ন, তাঁতশিল্প, বীশ, বেত ও কাঠের তৈরি শিল্প, চর্ম বা চামড়ার তৈরি বিভিন্ন পণ্য, গহনা, বিভিন্ন ধাতুর তৈরি শৈল্পিক তৈজসপত্র, গৃহশ্যালি সামগ্রী, হাতিয়ার ইত্যাদি। এ ছাড়াও কারুশিল্পের ধারায় তৈরি আরও কিছু শিল্প আছে, যেগুলোকে আমরা লোকশিল্পরূপে চিহ্নিত করে থাকি। যেমন- পটচিত্র, মাটির ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন খেলনা হাতি, খোদ্দা, মানুষ, পাখি। গোড়ামাটির ফলকচিত্র, নকশিকাঁধা, নকশি পাতিল বা শব্দের ইঁড়ি ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পকলার প্রধান দুই ধারার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা মিলিয়ে এর জগৎ অনেক বড় ও বিস্তৃত।

কাজ : একটি ছকের মাধ্যমে শিল্পকলার প্রধান দুটি ধারা এবং এর শাখা প্রশাখাগুলো দেখাও।

পাঠ : ৬

শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব

আদিম যুগের সেই বন্য, লোম দাড়িওয়ালা গৃহবাসী মানুষদের আঁকা ছবিই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো শিল্পকলা এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। যারা এ ছবিগুলো এঁকেছে, হাঙ্গার হাঙ্গার বছর আগে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু তাদের আঁকা ছবিগুলো এখনো টিকে আছে। আর শুধু টিকে আছে কালে ভুল হবে। সেই সব ছবিগুলো, আদিম মানুষদের তৈরি বিভিন্ন মূর্তি, পাত্র ও হাতিয়ার আমাদের সামনে মেলে ধরে আছে ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায়। তবে দেখ তখন ভাবা পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, পিগির আবিষ্কার তো দূরের কথা। সূতরাং তখনকার কোনো লিখিত ইতিহাস তো আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু আদিম গৃহবাসী সে সব মানুষদের জীবনযাপন, আচার ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এ সব কিছু না জানলে তো মানব জাতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যেত। লিখিত ইতিহাস আমরা পাইনি বটে, কিন্তু তাদের করা ঐসব শিল্পকর্মগুলোই আজ ইতিহাসের স্বাক্ষর। শিল্পকর্মগুলো দেখে, ছবি দেখে আমরা আদিম মানুষের জীবন সঞ্জায়, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের চিন্তা, বিশ্বাস সবই জানতে পেরেছি।

এভাবে আদিম যুগের পরে পুরোনো প্রস্তর যুগ বা পুরোনো পাথর যুগ, নতুন পাথরের যুগ, কৃষিযুগ প্রভৃতি সভ্যতার সবগুলো পর্যায়কেই আমরা জেনেছি মানুষের বস্তুগত সত্যকৃতির নিদর্শন থেকে। অর্থাৎ ঐ সভ্যতায় মানুষ যে সকল হাতিয়ার, বাসনপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাটি ইত্যাদি ব্যবহার করত তা থেকে। মানুষের ব্যবহৃত ঐসব সামগ্রিকেই এখন আমরা কারুশিল্প বলে থাকি। সূতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানব সভ্যতা ও শিল্প হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে, তাই কলা হয় শিল্পের বয়স মানবসভ্যতার সমান। ঐ সমস্ত শিল্পকলার মাধ্যমে আমরা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে জানতে পেরেছি। এ থেকেই আমরা শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

পাঠ : ৭

কোনো সমাজ, দেশ বা জাতির পরিচয়কে আমাদের সামনে ভুলে ধরে তাদের শিল্প ও সংস্কৃতি। শিল্প একটি বিশেষ সময়কেও ধরে রাখে। যার থেকে আমরা ঐ সময়ের অনেক উপাদানকে পেরে যাই। যেমন মিশরীয় চিত্রকলা। মিশরীয়রা ছবি আঁকত মন্দিরে অথবা পিরামিডের ভিতরে। পিরামিড হচ্ছে রাজা, বাদশা বা বড়লোকদের কবর ঘর। ক্রিস্ট জ্ঞান আকৃতির বিশাল বিশাল পাথরের তৈরি বিরাট-বিরাট সমাধি। এর ভিতরের



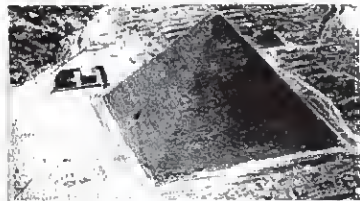
প্রথম ঘরবাড়ি



সবচেয়ে পুরোনো মৃৎপাত্র



মুতিসত্ত্ব "ডলমেন"



মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড 'পিরামিড' উচ্চতা ৪৮০ ফুট

দেয়ালে, মুতের কবিনে, মন্দিরে মিশরীয়রা হাজার হাজার ছবি আঁকত। সবটুকু জায়গা ছবি দিয়ে ভরে পিত। একটুও ফাঁকা রাখত না। এসব ছবিতে কিছু কিছু গৃহপালিত জীবজন্তুর ছবি থাকলেও বেশিরভাগই থাকত নারী, পুরুষ, রাজা, রাণী ও সেব-সেবী। তাদের অধিকাংশ ছবিই গল্প বলা ছবি। অর্থাৎ ছবিগুলো দেখলেই এর ঘটনা বোঝা যায়। কখনো কখনো ছবির সাথে তাদের ভাষায় এর ব্যাখ্যাও থাকত। এসব ছবিগুলো দেখেই আজকে আমরা মিশরীয় সভ্যতা ও সত্যকৃতির কথা জানতে পারি। ঐ সময়ে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রাজা-রাণী, জনগণ ও তাদের জীবনব্যাপ্তি, নিয়ম-কানুন, আচার-বিশ্বাস সবই বলে দেয় ঐ ছবিগুলো আর তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন কলুশিল্পসামগ্রী। পিরামিডগুলোও মিশরীয় স্থাপত্যের বিষয়ক নিদর্শন। মূলত মিশরীয় শিল্পকলাই আমাদের সামনে তার জড়িত ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে হাজির করেছে।

কাজ : পিরামিড সম্ভার্ডে তোমার ধারণা-১০টি বাক্যে লেখ। পাশে পিরামিডের একটি ছবি আঁক।

পাঠ : ৮

শিল্পকলা ও স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন আমরা গ্রিসে এবং ভারতবর্ষেও পাই। মধ্যযুগের গ্রিস ও ভারতবর্ষের সাহিত্যকর্ম সারা বিশ্বের অহংকার। ইশোরা ও অজন্তার গুহচিত্র প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। পালযুগের পুঁথিচিত্র বা মোড়াল চিত্রকলা আমাদের সামনে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক কিছুকেই প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি ঐ সময়ের বিভিন্ন ভাস্কর্য ও বিভিন্ন স্থাপনা অর্থাৎ স্থাপত্যশিল্প ভারতবর্ষের অহংকার।



অজন্তা গুহর দেয়ালে রিগিক ভাস্কর্য

জায়গার ভাঙ্গমহল পৃথিবীর বিষয়। তাই শিল্পকলা চর্চার পুরুষ অপরিণীম। মানব সভ্যতা এগিয়েছে মূলত মানুষের সৌন্দর্যবোধকে কেন্দ্র করেই। গৃহবাসী মানুষ যখন গাছ, পাতা, পশুর হাড়, চামড়া, ডালপালা নিয়ে ঘর বানানো শিল্প তখন থেকে স্থাপত্যকলা আজকের অবস্থানে এসেছে শুধু মানুষের নিত্যনতুন সৌন্দর্যবোধের কারণে। মানুষ চলেছে তার ভৈরি ভরনকে শিল্পতত্ত্বে দেখতে। তাকে আরো সুন্দর করতে। পোশাকের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য আগম মানুষের গাছের ছাল, পাতা বা পশুর চর্মহীতো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকে নিত্যনতুন ব্যাশনের পোশাক আমরা পরিচয় করছি। ব্যাজারে গিয়ে আরও নতুন নতুন ডিজাইন ইচ্ছা। এসবই শিল্পের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণের কারণে। নিজের বেশ ও সৎকৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য, মানুষের স্বাতি, সৌন্দর্যবোধ ও জাতীয় ঐতিহ্যের বিকাশে শিল্পকার চর্চা পূবই গুরুত্বপূর্ণ। ছবি আঁকা ও শিল্পকর্ম যেমন-সহীত, চলাচিত্র বা সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে, মানুষের মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। সমাজকে সুন্দর করার জন্য, সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য, আনন্দে থাকার জন্য এবং নিজেকে ও নিজের অনুকৃতিকে প্রকাশ করার জন্য ছবি আঁকা, শিল্পকর্মের চর্চা করা একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এ কথাটা শিখার্য জরনুল আবেদিন এবং তাঁর সাথীরা এ দেশের মানুষকে বোঝাতে পেরেছিলেন বলেই আজ শিল্পকার চর্চা আমাদের দেশে এত গুরুত্ব পাচ্ছে।

কাজ : শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে আমরা নিজের দেশ ও দেশের সাংস্কৃতিকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারি। ছবি ও তাস্কার্ফ ছাড়া শিল্পকলার আর কোন কোন মাধ্যমে, কীভাবে তা সম্ভব বলে মনে কর।

পাঠ : ৯

ছবি আঁকা বা অন্যান্য শিল্পকর্ম মানুষের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই খুব ছোটবেলা থেকে কোনো শিশুকে যদি ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায়, তাহলে শিশু লেখাপড়ার উন্নতির সাথে সাথে তার চিত্রবোধের জ্ঞান উন্নত করতে পারবে। সুন্দর কী ও অসুন্দর কী তা সহজে বিচার করে তার কাজে সুরুটির পরিচয় দিতে পারবে। ছবি আঁকা ও অন্যান্য শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে একজন মানুষের মধ্যে অনেকগুলো গুণের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

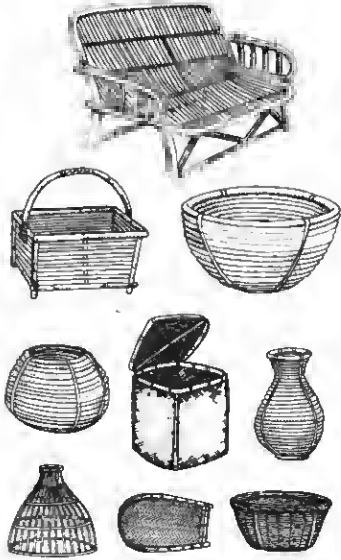
খাতার একটি ছোট কাগজে একটি শিশু যখন গ্রামের ছবি আঁকে তখন এ ছোট কাগজটিতে সে পুরো গ্রামের সবকিছুকে ধরতে চায়, যেমন—গ্রামের ঘরবাড়ি, গাছপালা, নদী—নৌকা, মানুষজন, গরু, হাঙ্গল, ফুল, পাখি সবকিছু। ছোট কাগজটিতে কোথায় ঘরবাড়ি হবে, গাছপালা কোথায় থাকবে, নদীটি কোথা দিয়ে বয়ে যাবে, নৌকা কয়টি থাকবে, কোথায় থাকলে ভালো লাগবে, নদীর পাড়ে ফসলের মাঠ, বাড়ির উঠানে গরু, মেয়েরা নদী থেকে পানি নিয়ে ফিরছে এ রকম অনেক বিবরণকে সুন্দর করে সাজিয়ে শিশুটি গ্রামের ছবি সৃষ্টিতে তৈয়ার চেষ্টা করে। ছোট একটি সাদা কাগজে এতকিছু একটি গ্রামকে আঁকতে গিয়ে শিশুটির মধ্যে ছোট জায়গায় সীমিত পরিসরে সবকিছুকে সাজিয়ে রাখার, সুন্দর করে সৃষ্টিতে নেবার ও শৃঙ্খলাবোধের চর্চা হয়। এরপর রং করার ক্ষেত্রেও কোথায় কী রং দিলে সুন্দর হবে, প্রকৃতিতে কোনটির কী রং এসব নিয়ে শিশুটি ভাবে। এতে তার নেবার ক্ষমতা, চিত্রার শক্তি, সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ সবই বৃদ্ধি পায়। ফলে এভাবে ছবি আঁকতে আঁকতে এক সময় তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, মানবিক গুণাবলি ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি সুন্দর কাজ, ভালো কাজ করার ব্যাপারে সে উদ্যমী ও সাহসী হয়ে গড়ে ওঠে। পরিণত বয়সে সে কোনো দায়িত্বগ্রহণ করতে ভয় পায়না। ধরা যাক সে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হলো, যে প্রতিষ্ঠানে শত শত কর্মী কাজ করে। সে কিন্তু সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠানটি চালাতে পারবে। যার যার কাজ ও দায়িত্ব সূত্রেভাবে বণ্টন করা তার জন্য সহজ হবে। কারণ ছোটবেলায় ছবি আঁকা চর্চার মাধ্যমে এ গুণ সে আয়ত্ত করেছে। ছবি আঁকা খুব সহজে মানুষকে সুনামের হিসেবে গড়ে তোলে। এমনকি উন্নত বিশ্বে বহু আগে থেকেই লেখাপড়ার অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ছবি আঁকাকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়।

পাঠ : ১০

শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ : চিত্রকলা ও কারুকলা

সামগ্রিক শিল্পকলার ক্ষণতে চিত্রকলা বা ভাস্কর্য তৈরি এবং কারুকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের সমাজজীবনেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রকলা ও কারুকলার অসীম গুরুত্ব রয়েছে। সমাজে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে চিত্রশিল্পী ও কারুশিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যে সব কর্মক্ষেত্রে শিল্পীরা পেশা হিসেবে শিল্পকর্ম করে যাচ্ছে তা হলো গ্রামের পেশাজীবী কারুশিল্পীর কাজ; যেমন— কামার, কুমার, তাঁতি, স্বর্ণকার, সুতার ও ঝাঁপ—বেতের কারুশিল্পী। মেয়েদের তৈরি নকশিকীবা, নীতলগাতি, জায়নামাজ, শতরঞ্জি, পাখা ইত্যাদি ছাড়াও বুনন ও সূচিনিয়ের মাধ্যমে হুণ হুণ ধরে বশ পরশ্রম্য গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে এ সব শিল্পকর্মের চর্চা আছে। যাকে আমরা নাম দিয়েছি লোকশিল্প, কারুশিল্প ও কুটিরশিল্প। বর্তমান আধুনিক জীবনযাপনে লোকশিল্প, কারুশিল্প ও কুটিরশিল্পের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে।

আধুনিক জীবনযাপনে ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে শিল্পীরা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। বইপুস্তক ও পরামিত্রিকর জন্য শিল্পী প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রকৌশলবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা স্থাপত্যশিক্ষায় দানারকম বিজ্ঞান চর্চা, ইতিহাস, ভূগোল চর্চায় চিত্রশিল্পের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। টেলিভিশনের প্রতিটি অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য ডিজাইনার এর প্রয়োজন। নাটক, সিনেমা তৈরিতে সেট ডিজাইনার বা অভিনয়শিল্পী ছাড়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের জন্য যেমন-বিমান তৈরিতে, জাহাজ নির্মাণে, মোটরগাড়ি, বাস, ট্রেন, টেলিভিশন, রেডিও, তৈজসপত্র, ভাল, চাবি, বৈদ্যুতিক ব্যাতি, ফ্যান, বোতল, টেবিল, কৌটা থেকে শুরু করে কলম, পেনসিল, ছুরি, কাঁচি বিভিন্ন আসবাবপত্রের সুন্দর চেহারা, রূপ ও গড়ন বা আকার-আকৃতি তৈরির জন্য চিত্রশিল্পীর একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন জিনিসপত্রের মোড়ক ও বিজ্ঞাপন, পোস্টার প্রভৃতি বিজ্ঞাপনী শিল্পের জন্য চিত্রশিল্পী প্রয়োজন। পোশাক বা ফ্যাশন ডিজাইনের জন্যও চিত্রশিল্পী ছাড়া চলে না। তাই শিল্পকলার চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং চিত্রকলা ও কারুকলার চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



বিভিন্ন প্রকার কারুশিল্প

পাঠ : ১১

ইতঃপূর্বের আলোচনায় আমরা শিল্পকলার বিস্তৃত ও নানামুখী বিষয় সম্পর্কে জেনেছি। চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও কারুশিল্প হাজার বছর ধরে বিশ্বের শিল্প ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। যেসব শিল্পকর্ম ও শিল্পীরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে জেনেছি। চীনাযুগে, জস্তো থেকে বতিচেন্নি, পেরুজীনো, রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলোসহ শ্রুণুময় ইতালিতেই জন্মেছিলেন বহু কালজয়ী শিল্পী, ভ্যারিট্যান সিটিতে সিস্তিন গির্জার ছাদের নিচে বাইবেলের ঘটনাবলি নিয়ে মাইকেল এঞ্জেলো যে ছবি একেছেন, তা বিশ্বশিল্পকে দিয়েছে অতুলনীয় সম্পদ। ছাদের নিচে মাচা বেঁধে টানা সাড়ে চার বছর চিত্র হয়ে শূয়ে শূয়ে এ কাজ তিনি শেষ করেন। মাইকেল এঞ্জেলো মূলত ছিলেন খ্যাতিমান ভাস্কর। গির্জার ছবিটি যখন শেষ হলো তখন পোটা রোমের লোক ফেটে পড়ল তা দেখার জন্য। আজও সারা বিশ্বের হাজার হাজার শিল্পশ্রেমিক রোমের সিস্তিন গির্জায় ঐ ছবি দেখার জন্য ছুটে যায়। আর একজন বিখ্যাত শিল্পী গিওনর্দো-দ্যা-ভিকি, তিনিও ইতালিতে জন্মান। তাঁর ঝাঁকা মোনালিসা পৃথিবী বিখ্যাত। বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিস শহরের লুভর মিউজিয়ামে সজ্জিত আছে ছবিটি।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আর একজন হচ্ছেন রেমব্রান্ট। তাঁর বিখ্যাত ছবি রাতের পাহারা। বিখ্যাত অন্য একজন শিল্পী পল সেজান। তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দেখে মনে হবে ছবির মধ্যে ঢুকে আমরা তার মাঠে, ঘাটে, পাহাড়ে বেড়িয়ে

পারি। তোমরা অনেকেই হয়তো ত্যানগুণ এর নাম শুনেন। তাঁর জন্য হ্যাভে। ফরাসি শিল্পী পল গট্যা ও ত্যানগুণ একসাথে কিছুদিন ছবি আঁকেন। তাঁরা দুজনেই চিত্রশিল্পের ইতিহাসে বিখ্যাত। আর এক শিল্পী মাতিস। তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি-নাচ। বিশ শতকের সেরা শিল্পীদের অন্যতম হচ্ছেন-পাবলো পিকাসো। শিশু ও পায়রা, মা ও শিশু, স্বপ্ন, পায়রা, গ্যুয়েনিকা, ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত ছবি। অন্যদিকে আধুনিক ভাস্কর্যের জনক অগাস্টিন রদ্যা এবং হেনরি মুরসহ বিভিন্ন ভাস্কররা তাঁদের ভাস্কর্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন শিল্পের জুবনকে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান শিল্পীরাও বিশ্বশিল্পে তাঁদের অবদান রেখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, হামিনী রায়, আব্দুর রহমান চুখতাই, আমাদের দেশের জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস.এম সুলতান, শফিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ শিল্পীদের কাজেও চিত্রকলায় জুবন সমৃদ্ধ হয়েছে।

অন্যদিকে কারুকাণ্ড সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে নিজে নিজে বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমৃদ্ধ করেছে শিল্পকলার জুবনকে।

বিশ্বশিল্পের এই বিশাল চিত্রকলার ভাঙার এত সমৃদ্ধ, এতবিখ্যাত সব শিল্পী আর শিল্পকর্ম রয়েছে যে সে সব এই স্বল্প পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না। তাই শুধু কিছু শিল্পী ও শিল্পকলার নাম উল্লেখ করা হলো। বড় হয়ে, উপরের ক্লাসে উঠে বা ভবিষ্যতে কোনো সময়ে নিজেদের আগ্রহে তোমরা চিত্রকলায় এই বিশাল ভাঙার সন্সর্কে বিভিন্ন বইয়ে জানতে পারবে। এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী সন্সর্কে সংক্ষেপে জানতে পারবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সমগ্র শিল্পকলাকে প্রধানত—

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ক. দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে | খ. তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে |
| গ. চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে | ঘ. সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে |

২। আদিম মানুষের তৈরি বেশিরভাগ ভাস্কর্যই ছিল—

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক. পশু মূর্তি | খ. নরমূর্তি |
| গ. পাখির মূর্তি | ঘ. নারী মূর্তি |

৩। পিরামিড হচ্ছে বিশাল বিশাল পাথরের তৈরি—

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ক. ত্রিভুজ আকৃতির মন্দির | খ. ত্রিভুজ আকৃতির সমাধি |
| গ. চতুর্ভুজ আকৃতির ভবন | ঘ. বিশাল পাথরের মূর্তি |

৪। মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন মূলত খ্যাতিমান—

ক. ভাস্কর

খ. চিত্রশিল্পী

গ. স্থপতি

ঘ. সংগীতশিল্পী

৫। সংগীত, নাটক, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য হচ্ছে—

ক. মানবিক কলার শাখা

খ. দলিতকলার শাখা

গ. কাব্যকলার শাখা

ঘ. পদ্য সাহিত্যের শাখা

৬। আদিম সমাজ ছিল—

ক. মাতৃতান্ত্রিক

খ. পিতৃতান্ত্রিক

গ. ভাতৃতান্ত্রিক

ঘ. ভগ্নিতান্ত্রিক

লিখে ছাব্ব দাও

১. শিল্পকলা বলতে কী বুঝ? পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পকলা কী?

২. শিল্পকলার প্রধান দুইটি শাখা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৩. একটি ছক ঐক্রে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখাগুলো দেখাও।

৪. শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৫. প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলা সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

৬. সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রকলা ও কারুশিল্পের ভূমিকা বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও শিল্পকর্ম



শিল্পচার্য জেমস টার্নারের আঁকা 'মইসেয়া'

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- বিশ্বের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের ব্যাতিমান শিল্পীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের শিল্পকলায় মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার সন্তোষের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

বিখ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও শিল্পকর্ম

পার্ভ : ১

টিসিয়ান

(১৪৭৭-১৫৭৬)

ইতালির আলস অঞ্চলের প্রাকৃতিক সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে টিসিয়ান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সে কারণে সামাজিক ও সঙ্কুচিতমনা পরিবার হিসেবে তাঁদের একটা খ্যাতি ছিল। শৈশব থেকেই টিসিয়ান ছিলেন তাবুক ও কবি প্রকৃতির। এর কারণ ছিল অনুশ্রম প্রাকৃতিক পরিবেশ, পার্বত্য দ্রোণধারা, সুশোভিত গম্বুশৃঙ্গ, পাইন বন, উন্মুক্ত আকাশ। এ সবকিছুই তাঁকে প্রভাবিত করেছে ছবি আঁকার অনুরাগী হতে, বাবা চেয়েছিলেন তাকে আইনজ্ঞ করতে। এ জন্য তাঁকে তেনিসে পাঠালেন। কিন্তু তিনি বন্ধু জর্জনের কাছে কুড়ি বছর বয়সে ছবি আঁকার প্রথম হাতেখড়ি নেন।



শিল্পী টিসিয়ান

জন্মদিনের মধ্যেই টিসিয়ান নিজ প্রতিভা ও আভিজাত্যের জন্য অভিজাত সমাজে নিজেকে চিত্রশিল্পী হিসেবে তুলে ধরেন। প্রতিভা ও কল্যাণশীল উভয় প্রকার চিত্রেই টিসিয়ানের দক্ষতা ছিল। তেনিসিয়ান চিত্রশিল্পীদের মধ্যে টিসিয়ান ছিলেন সর্বকথিত এবং তিনি ইতালীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের গৃহশোভকতা শেয়েছেন। তা ছাড়া ঐ সময় শিল্পকলার জন্য ইতালির ফ্লোরেন্সের যেমন খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক বণিজ্যকেন্দ্ররূপে তেনিসেরও তেমনি যথেষ্ট খ্যাতি

ছিল। তেনিসে তিনি রাজকীয় শিল্পপত্রাঙ্গ হন। শিল্পপ্রতিভা ছাড়াও মানুষ হিসেবেও টিসিয়ান ছিলেন অত্যন্ত তদ্র। নিজের জ্ঞান ও চিত্রের মান সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন।

রক্তের উপর ছিল টিসিয়ানের দৃষ্টি দক্ষতা, যাত্র হর যাস বয়সে টিসিয়ান যাতুহীন হন আর সে কারণেই জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর জন্মের এই স্বাক্ষর গোপন করতে পারেন নি।

জীবনের শেষ সময়ে এসে Mother নামে বিখ্যাত চিত্রখানি অঙ্কন করেন। তাঁর কলনা ছিল বিশুযাতা খেরীর মধ্যে নিজ মায়ের বিগত খাতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁর মাকে স্নান দেখতেন— যা খেন তাঁকে ডাকছে। তাই তো তিনি তাঁর কঙ্ক ও ছয়নের কলতেন। যা জামাকে ডাকছেন আমি শীঘ্রই তোমাদের যেড়ে চলে যাব।



শিল্পী টিসিয়ান এর খাতা 'Mother'

১১ বছর বয়সে স্নেহ রোগে অরুণত হয়ে এই শিল্পী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মাতৃমূর্তি ছবিটি অঙ্কন শেষ হয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত ছবিশুলার মধ্যে আরও আছে—

Dance and The Shower of gold, Bachus and Ariadne, Salome and head of John ইত্যাদি স্বকল্পে লন্ডনের ইন্সটিটিউশন অফ গ্যালারিতে সংগৃহীত আছে।

কাজ : চিত্রশিল্পের Mother চিত্রটি সম্পর্কে লেখ।

পাঠ : ২

রেমব্রাণ্ট

(১৬০৬-১৬৬৯)

রেমব্রাণ্ট জনপ্রিয় করেছিলেন হল্যান্ডের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক কেন্দ্র লেইডেন (Leyden) ১৬০৬ সালের ১৫ জুলাই। তাঁর পিতা ছিলেন বিশপাণী লোক। তাঁর ইচ্ছা ছিল পুর উচ্চশিক্ষা নিয়ে লেইডেনে একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠাপাণ্ড করবেন। কিন্তু রেমব্রাণ্টের এই পদানুগতিক সাধারণ শিক্ষা ভালো লাগত না। পড়ার বইয়ে তিনি জীবজন্তুর ছবি ঐক্যে রাখতেন। পিতা তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে ১৩ বছর বয়সে জ্যাকোব ভ্যান (Jacob Van) নামের একজন



শিল্পী রেমব্রাণ্ট



শিল্পী রেমব্রাণ্ট এর আঁকা 'সলোম'

স্বাধীন শিল্পীর নিকট প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে প্রতিকৃতি চিত্রকর Dieter Lastman এর নিকট কৃতিত্বের সমালোচনা শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৬২৪ সালে রেমব্রাণ্ট লেইডেনে ফিরে এসে একটি শিল্পী চক্র গঠন করে স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন।

গঠিত বছর বয়সে রেমব্রাণ্ট অতি অল্প দিনের মধ্যে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুন্দর প্রকৃতি চিত্রকর হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতি দ্রুত ব্যবসা জমে ওঠে, বন্ধু চিত্রের ফরম্যাশন পেতে থাকেন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও শিল্পীকে ফরম্যাশন দিতে থাকে। শুরুর পেরিওড নয় সুন্দর এটার (etcher) রূপেও তাঁর কৃতিত্ব প্রচারিত হয়, এটিং কাঙ্ক্ষেও রেমব্রাণ্টের অল্পত দক্ষতা ছিল।

রেমব্রাণ্ট একসময় মুদ্রণ চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঐ পদ্ধতির অনেকগুলো চিত্র নকল করেছিলেন, কিন্তু ঐগুলো মুদ্রণ চিত্রের নামে উল্লেখ হয়নি।

অতীত লভনের সঙ্গরে সোভিয়েৎ কেশানি প্রেমভ্রমণের আঁকা শাহজাহানের একমনি চিত্র খুঁজ তাঁর শৌর্যকল্পন কৃতিত্বের জন্য ১,৭৫,০০০ টাকার ভ্রম করেন। ভ্রমভের মূল মুদ্রা তিন এর শতকরা দুগুণও ছিল হারনি।

চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে রেব্রাণ্ট ছিলেন নির্ভীক ও আত্মশ্রুতেন। চিত্রের বিষয়বস্তুসূর সাথে আঁদের সটকীরতাই তাঁর চিত্রকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বিদ্যাসের দিক থেকে তিনি ছিলেন দুশিল্পী। সঙ্গ্রহ, হকির যথো পটীর টোল ও নবদ্বীপ কেশাখিলনের বর্ণ সন্নাতি তারনাথ্য রক্ষার, শিল্পীর অকৃত কলাকর্মানের পরিকল্পনাও হারনি।

রেব্রাণ্ট ৩৬ বছরের কর্মজীবনে এটি, দুই ৩ পেইন্টিং মিশিয়ে করেক হাজার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে- The blindness of Tobit, ধর্মবিশ্বক চিত্রের মধ্যে The Raising of Lazarus Christ at Emman (শুভ্র বিউজিয়ারে সম্মতিত) সামাজিক উত্থাপিতের মধ্যে Samsons Wedding Feast কেশাখিলন ধরনের প্রতিকৃতির মধ্যে An old man in Thought ও Flora উদ্ভাবন্য চিত্র।

১৮৬৯ সালে এই মহান শিল্পী পরলোকগমন করেন।

কবি। রেব্রাণ্ট সম্পর্কে কয়েকটি কথা লেখ।

পাঠ। ৩

মার্কিন

(১৮৬৯-১৯৫৪)

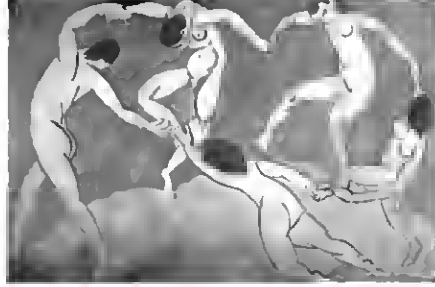


শিল্পী মেরি মার্কিন

১৮৬৯ সালে উত্তর ভ্রমণে মার্কিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে মার্কিন আধুনিক ও রঙীন বহু শিল্পীরূপে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। দুই বা ততোধিক প্রতি ছিল তাঁর অকৃত নকড়া। প্রত্যেক রীতির মধ্যেই তিনি নিজস্ব স্বাধীন সত্ত্ব রীতির সন্ধান করেছেন। কখনো পারস্য ঐতিহ্যের অনুপ্রাণিত কিছুদিন নিশুটিয়ের ন্যায় রিড্রীতিতে অঙ্কন করতে গিয়ে মুকুতে পারেন, ঐ পদ্ধতি তাঁর উপযোগী নয়, কারণ তাঁর মূলক প্রথাবিদ্যাস কদমতা পণ্ডিত্য প্রকৃতি অন্তরায় হয়েছিল। বাধ্য হয়ে তিনি এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন যাতে চিত্রা, লিটা, নিউত জাফটসমানসিগ ও নিশুটিয়ের ন্যায় সরলতাপূর্ণ ছিল। তাঁর চিত্রে বর্ণ ও রেখার হ্রস্ব প্রবাহে সমান্তরী শিল্পের তাল, মান, লর গ্রিক শা থাকলেও দর্শককে আকৃষ্ট করে। কল্পন মূল বস্তুরের সঙ্গে পরিপার্শ্বিকতার সন্নাতি রাখা করে অলঙ্কারমূল রেখার বিদ্যাসে মার্কিন হৃদয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। আলোহারা প্রেরণ সংকেত করার চিত্রাণো বিচারিক আকৃতি ধারণ করেছে।

বিষয় নির্ভরনে তিনি ছিলেন সাধারণ। একটা সামান্য বিষয়কেও শিল্পী তাঁর দক্ষতার ডাকে প্রোঁঠ দান করতে পারেন। শিল্পীর অলঙ্কারেণ চিত্রের বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। এটা তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিকতার উপর নির্ভরশীল। বিষয়ের বাহ্যিকত্ব শিল্পীর পিকট সত্য হতে পারে না। শিল্পীর অভ্যন্তর প্রতিকলিত প্রকৃতি বা বিষয়ের দুই চিত্রের প্রকৃত হ্রস্ব।

মাতিসের চিত্রে পরিশ্রুতিক উপেক্ষিত হয়েছে- প্রতিকৃতিটিয়ে লাল, নীল প্রকৃতি বর্ণ তিনি নিজ খেলায় খুশিতে প্রয়োগ করেছেন। বর্ণ ভারী ও উজ্জ্বল। The Dance নামক চিত্রখানি মাতিসের একখানি বিখ্যাত চিত্র। এটা এখন মস্কোতে আছে। চিত্রখানি বসিষ্ঠ রেখা ও Wash এ অঙ্কিত হয়েছে। চিত্রের একদল নারী-পুরুষ ছাপিক গতিতে চক্রাকারে নৃত্যরত।



শিল্পী হেনরি মাতিস এর আঁকা 'The Dance'

মানুষগুলো এখানে হৃৎক, তাদের সৈহিক হৃৎ প্রকাশ করা শিল্পীর উদ্দেশ্য নয়, তিনি নৃত্যের অন্তর্নিহিত ছাপিক হৃৎ ও গতি প্রকাশ করার জন্য চিত্রখানি অঙ্কন করেছেন। পূর্ব স্বচ্ছ বর্ণ, স্বচ্ছ রেখা, স্বচ্ছ কলাকৌশল ও পরিশ্রমের দ্বারা বিবয়ের ভাব প্রকাশ করার যে মতবাদ, তার সার্বিক হৃৎ মাতিসের বিখ্যাত Head of a Woman চিত্রে। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

কাজ : মাতিসের চিত্রকর্মের বৈশিষ্ট্য লেখ।

পাঠ : ৪

পল সেজান

(১৮৩৯-১৯০৬)

আধুনিক চিত্রকলার জনক পল সেজান ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে রোন নদীর তীরবর্তী এক গ্রন্থে জনমগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ব্যাংকার। আর্থিক অবস্থা ছিল সমৃদ্ধ। প্রথমে যখন তিনি প্যারিসে গেলেন, অত্যন্ত লাজুক থাকার কারণে লোকের সাথে মিশতে পারতেন না। তাতে পারিপার্শ্বিক লোকেরা মনে করতেন সেজান অত্যন্ত দান্তিক। পিতার আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় দশ বছর পর্যন্ত তিনি চিত্রকলা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ছবি আঁকার তৃষ্ণা তাঁর মিটল না। সেজানের ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাদামাটা এবং নানা ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ। সবসময় কঠোর পরিশ্রম করতেন। ছবি আঁকা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মের জন্য কখনোই সম্মান বা স্বীকৃতি পাননি। প্যারিসের শিক্ষা ও অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি আবার নিজ জন্মস্থানে ফিরে আসেন। ব্যাংকার বাবার দেয়া মাসিক ১২ পাউন্ড ভাতা দিয়ে চলতেন। তিনি ছবি



শিল্পী পল সেজান



শিল্পী পল সেভানের ঔঁকা স্টিল লাইফ

করেছিলেন যার নাম ছিল Post Impressionism. তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মাঝে রয়েছে— তাস খেলা। ১৯০৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

কাছ : Post Impressionism— এর ধারা তে তৈরি করেন। তাঁর সম্ভর্কে কয়েকটি বাক্য লেখ।

পাঠ : ৫

অগুস্ত রদ্যা

(১৮৪০-১৯১৭)

ফ্রঁসোয়া অগুস্ত বেনে রদ্যা ফ্রান্সের পারীতে ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না। মাথা ভর্তি লাল চুল, লাল মুখেরা বালক রদ্যা অন্যান্য সমবয়সী হৈ চৈ করা ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশতে পারতেন না। কিন্তু একা একা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল পাগলের মতো নেশা। শৈশব থেকেই শিল্পকলার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দুর্বলতা। বাল্যকালে পাঠ্যবই-এর ইলাস্ট্রেশন ও ছবি দেখে সে রকম আঁকার চেষ্টা করেও কোনো শিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারেন নি। ছবি আঁকার রং, তুলি, ক্যানভাস এগুলোর ব্যয়ভার যোগাতে পারবেন না সেজন্য সিংহাস্ত্র নেন ডাক্তর হওয়ার, অস্ত্র মাটিটা বিনামূল্যে যোগাতে পারবেন ভেবে।

তিনি একটি প্রাইভেট বোর্ডিং স্কুলে বছর দুই পড়াশুনা করেন। কিন্তু ল্যাটিন ও অন্যান্য গাভানুগতিক বিষয়ে পড়তে তাঁর



ডাক্তর অগুস্ত রদ্যা

বিক্রয় করা পছন্দ করতেন না। অস্ত্রের গভীর উপলব্ধি থেকে প্রকৃতি ও জীবনকে রঙের মায়াজালে বন্দি করার জন্যই তিনি ছবি আঁকতেন।

কখনো কখনো বাইরের চিত্র অঙ্কন করে তা যখন সমাপ্ত হতো এগুলো ঘরের নিকটবর্তী ঘোপের মাঝে ফেলে দিয়ে খাপি হাতে বাড়ি ফিরে আসতেন। আর এ কারণে গোপনে তাঁর স্ত্রী তাকে অনুসরণ করতেন এবং ছবিগুলো সংগ্রহ করে গৃহের এক কোণায় লুকিয়ে রাখতেন। বশা যায় তিনি জীবিকার জন্য ছবি আঁকেন নি, বরং ছবি আঁকার জন্যই তিনি বেঁচে ছিলেন। তিনি ছবি আঁকার একটি ধারা তৈরি

মোটাই ভালো লাগল না। অবশেষে ছবি আঁকার প্রতি
হেঙ্গের দুর্নিবার আকর্ষণ দেখে বাবা তাঁকে একটি
চিত্রকলার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। শিক্ষক ছিলেন
হোরেস লিকক দ্য বয়বট্ট। অত্যন্ত দক্ষ শিক্ষক
লিকক ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থে
নিজের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন যে,
তিনি সর্বাগ্রে চেষ্টা করতেন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব যেন
বিকশিত হয়। সে যেন নিজের চোখ দিয়ে জীবনকে
দেখতে শেখে এবং তারপর সেই দেখার মূর্তিকে
অবলম্বন করে আঁকার কাজে প্রবৃত্ত হয়। ভাস্কর্য
তৈরি শেখার মধ্যে ডুববে যাবার পর রদ্য্য শূন্য এই
স্কুলের ক্লাসের মশেই নিজেই আবলম্ব রাখেন নি।
তিনি লুভ্যারে গিয়ে প্রাচীন মার্বেলের ভাস্কর্যগুলো
আবিস্কার করলেন। ইম্পেরিয়াল গ্রন্থাগারে গিয়ে
খোদাই কাজগুলোর ছবি আঁকলেন। যোড়ার হাটে
গিয়ে জীবন্ত মডেল থেকে স্কেচ করলেন। এ সময়
রদ্য্য ম্যানুফ্যাকচার দ্য গবলিতে যোগ দেন। প্রথম



রদ্য্যার তৈরি ভাস্কর্য 'দ্য থিংকিং'

থেকেই রদ্য্যকে তাঁর নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে হয়েছে। অসন্তুষ্ট মনোবল, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস
নিয়ে কাজ করেছেন। এ সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা শহর ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন মূর্তি ও মানুষের ড্রইং করতেন।

রদ্য্যার যৌবন কেটেছে কাজ নিয়ে উন্মত্ততায় এবং পোক সমাজের অজ্ঞাতে। এ সময় কবি বোদলেয়ার ও দান্তের কবিতা
ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। রদ্য্য আজীবনই ছিলেন কাজ পাগল মানুষ। তাঁর ভাস্কর্যে গতি ও প্রাণময়তা ভাস্কর্যকে নিয়ে
এসেছিল জীবনের কাছাকাছি। তাঁকে অনেকে সে সময়কার ইম্প্রেশনিষ্টদের সাথে তুলনা করলেও তিনি ছিলেন কিছুটা
সিম্পলিস্ট বা প্রতীকী ধারার শিল্পী। বক্তব্য ও গতিময়তা তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য হলেও ভাস্কর্যের অন্য সব নিয়ম-
ব্যাকরণগণও ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষভাবে। ভাস্কর্যগুলো ছিল প্রাণময় ও আবেগপূর্ণ। তাঁর নিজের উক্তিতে
বলেছেন -

'শিল্পের প্রকৃত সৌন্দর্য সত্যের উন্মোচনে যদি কেউ তার দেখার জিনিসকে নির্বোধের মতো শূন্যই দৃষ্টিভঙ্গন করতে
চায়, কিংবা বাস্তবের দেখা কর্দর্যতাকে আড়াল করতে চায়, কিংবা তার অন্তর্গত বিবাদকে লুকিয়ে রাখতে চায়, তাহলে
তাই হবে প্রকৃত কর্দর্যতা, আর সেখানে কোনো খাঁটি অভিব্যক্তিও থাকবে না। তিনি আরও বলেছেন - শ্রেষ্ঠ শিল্প মানব
এক জগত সম্পর্কে যা কিছু জানবার সবই জানিয়ে দেয়। কিছু তারপরও যা জানায় তা হলো সেখান এমন কিছু আছে
যা চিরকাল অজানাই থেকে যাবে। প্রত্যেক মহৎ শিল্পকর্মের মতোই থাকে রহস্যের এই গুণাবলি।'

রদ্য্য সর্বদা তাঁর উপকরণকে খোলা মনে গ্রহণ করেছেন, কখনো তাকে লুকাতে বা তার কাছ থেকে পাগিয়ে যেতে
চাননি। তাঁর ফিগারগুলো দেখলে মনে হয় সেগুলো যেন তাদের আদি পাখর কিংবা মাটির অবস্থা থেকে সরাসরি উঠে
এসেছে। মাইকেল এঞ্জেলো তাঁর কোনো কোনো ফিগার কিছুটা অসম্পূর্ণ রেখেছেন পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিকূলতার
কারণে, বহুগত সীমাবদ্ধতার জন্য। কিন্তু রদ্য্যার কোনো কোনো ফিগার যাকে অসম্পূর্ণতার চিহ্ন বলে মনে হয় তা
শিল্পীর সচেতন সৃষ্টি, তার মধ্যে হুটে উঠেছে শিল্পীর নিজস্ব ডিজাইনের বিশেষ অভিব্যক্তি। রদ্য্য কখনোই নিহত
বর্ণনায় ডুবেছেন নি। সর্বদা তিনি আরো এক পা এগিয়ে গেছেন। তাঁর কাজ বহুমাাত্রিক। আমরা সেখানে পাই বাস্তবতা,
রোমাণ্টিকতা, অভিব্যক্তিবাদ, ইম্প্রেশনিজম এবং যৌনতার অনুষঙ্গমাখা মর্যাদাবাদ।

তার উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে দ্য বিকোর, চুম্বন, বালজাক, দ্য সাইরেল, দ্য সিক্রেট, অনন্ত বসন্ত, ইত্যাদি, তিন ছায়ামূর্তি প্রভৃতি।

রঙ্গী আত্মবিশ্বাস তৈরি করে গেছেন ভাস্কর্য নিয়ে এবং বিশ্বাস করেছেন চিত্রাই মানুষের অন্যতম সমগ্রায়। অগ্নিস্ত রঙ্গী পরোক্ষেগমন করেন ১৭ই নভেম্বর। তার মরদেহ সমাধিস্থ হয় মাদ্রিডে ২৪শে নভেম্বর। তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী দ্য বিকোর ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছে তার সমাধি শিরে।

পাঠ : ৬

রামকিঙ্কর বেইজ

(২৬শে মে ১৯০৬-২রা আগস্ট ১৯৮০)

১৯০৬ সালে ২৬শে মে বাবা চমীচরণ ও মা সম্পূর্ণ দেবীর কোলে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় যোগীপাড়ার এক আদিবাসী গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বড় অভাবী পরিবার, কৌরকর্মই জীবিকা, শৈশবে কুমোরদের ছবি আঁকা দেখে আপনমনে ছবি আঁকতেন ভূপের মতো রং-তুলি দিয়ে। মামার বাড়ি বিষ্ণুপুরের সাদাকুলি যাওয়ার গাথে সূত্রধরদের বসবাস। সে সময়ই অনন্ত সূত্রধর নামের এক মিস্ট্রির কাছে রামকিঙ্করের মূর্তি গড়ার প্রথম পাঠ। এছাড়া বিষ্ণুপুরের মন্দিরের কাজও তাকে টেনেছে। মন্দিরের পোড়ামাটি আর পাথরের কাজের নকশা করেই শিল্পীর গণ চলা শুরু। বাঁকুড়ার বিখ্যাত শিল্পী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে এই তরুণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ, কলাকর্ম আকৃষ্ট হওয়ার মতো। তিনি রামকিঙ্করকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে শান্তি নিকেতনের কলাভবনে নন্দনাল বসুর



শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ

কাজে অর্পণ করেন। লেখাপড়া যতটুকু করেছেন তাতে সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহ ছিল না। ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়াতেই ছিল তার আসল মনোযোগ। তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বড় হবেন এই ছিল তার আদর্শ ও চিন্তা, সে কারণেই রামকিঙ্কর ছিলেন ভারতীয় সাঁওতাল ভাস্কর। তিনি আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যকলার অন্যতম অগ্রপথিক। যিনি আধুনিক পাচাত্তা শিল্প অধ্যয়ন করে সেই শৈলী নিজের ভাস্কর্যে প্রয়োগ করেন। তাঁকে ভারতীয় শিল্পে আধুনিকতার জনক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্পী মনে করা হয়। রামকিঙ্করের কাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য গতিশীলতা। তার ছবি এবং ভাস্কর্যের প্রায় সকল আকৃতিই গতিশীল। কেউই থেমে নেই। তার বড় ভাস্কর্যের বেশিরভাগই উন্মুক্ত জায়গায় করা।

রামকিঙ্করের পেশাগত জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় ১৯৩৪ সালে। তিনি যখন কলাভবনের স্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালে অনেকগুলো কাজ তিনি শেষ করেন। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে রিলিফ, সাঁওতাল দশভি, কুম্ভপোশিনী, সূক্তাতা প্রভৃতি। ১৯৩৭ থেকে তিনি ছায়াদের মডেলিং শেখানোর দায়িত্ব নেন। ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়টাকে রামকিঙ্করের তেলরং পর্বের শুরু ধরা হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তেলরং চিত্রের কাজ শেষ করেন। মহাডা গান্ধী, সুখ ও সুভাষা, হাটে সাঁওতাল দশভি,

কাজের শেষে সাঁওতাল রমনী, শিলা সিরিজ, শরৎকাল, ফুলের ছন্দ, নতুন শস্য, বিনোদিনী, মহিলা ও কুকুর, গ্রীষ্মকাল তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্র। একই সময়ের মধ্যে শেষ হয় তাঁর অনেকগুলো বিখ্যাত ভাস্কর্যের কাজও, তাঁর সৃষ্টিকর্মের কাল বিচারে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বলা যেতে পারে। এই পর্বে করা তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে কথক্ৰিটে তৈরি সাঁওতাল পরিবার, প্রস্টারে করা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, সিমেন্ট দিয়ে হেড অব এ ওমান, বাতিদান অন্যতম।

ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়ায় যে “সুজাতা” মূর্তিটি স্থাপিত আছে এটিকে শিল্পী তাঁর একটি প্রিয় কাজ বলতেন। তিনি বলতেন – ওটি নড়ে, কথা বলে। প্রতিদিন যাদের নানাভাবে ও নানা কাজে দেখেছেন রামকিঙ্করের তাদের কথাই জীবন ভর ভেবেছেন, তাদের তিনি ভাণ্ডাবেসে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এনে সকলের সম্মুখ চিত্রে ও ভাস্কর্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

অভিনয় ও সংগীতের প্রতিও তাঁর প্রচন্ড আকর্ষণ ছিল। শান্তিনিকেতনে অনেক নাটক রামকিঙ্করের নির্দেশনায় অভিনীত হয়েছে। রামকিঙ্কর চিরকুমার ছিলেন। ঘর বাঁধা হয়নি এই আত্মতাপা শিল্পীর। অনলসভাবে তিনি প্রায় ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত কলাশিল্পীর উপাসনা করে ১৯৮০ সালের ২রা আগস্ট পরলোকগমন করেন।



শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের তৈরি “সুজাতা”

পাঠ: ৭

বাংলাদেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের পরিচিতি

বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পকলার যাত্রা শুরু ১৯৪৮ সালে। তখন দেশের নাম পাকিস্তান। আমাদের এই অঞ্চলের নাম পূর্ব পাকিস্তান। বর্তমানে যেটা বাংলাদেশ। ভারত ভাগ হয়ে দুই দেশ হওয়ার ফলে পাকিস্তানের পূর্ব অংশ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরে অনেক মুসলমান নাগরিক চলে আসেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। তারা নতুন স্বাধীন দেশে নতুন করে গড়ে তোলেন, নতুন প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা ও নতুন জনপদ। কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। এরা হলেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন (পরে শিল্পাচার্য উপাধি পেয়েছেন), কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিউদ্দিন আহমেদ, শফিকুল আমিন, খান্না শফিক আহমদ প্রমুখ। এরাই উদ্যোগ গ্রহণ করে ও অনেক চেষ্টা করে শিল্পকলা শিল্পার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট। মাত্র বারো জন ছাত্র নিয়ে প্রথম ছবি আঁকার ক্লাস শুরু হয়। পাঁচ বছরের শিক্ষা কোর্স। প্রথম দলটি পাস করে বের হন ১৯৫৩ সালে। তারপর প্রতি বছর কয়েকজন করে শিল্পকলায় শিক্ষা লাভ করে পাস করতে থাকেন। এই নবীন শিল্পীদের অনেকেই তখন দেশের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার উন্নত দেশগুলোতে চলে যান, শিল্পকলায় উন্নততর শিক্ষাগ্রহণ করতে। কয়েক বছর পর এরা দেশে ফিরে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতা, নতুন ধ্যান ধারণায় আঁকা ছবি ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী করে দেশের শিল্পকলার প্রসার ঘটাতে থাকেন। অনেকেই

যোগ দেন এই আর্ট ইনস্টিটিউটে। পুরোনো প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকরা নবীন শিক্ষকদের পেয়ে শিল্পকলা শিক্ষাকে আরও উন্নত করতে থাকেন। ধীরে ধীরে শিল্পীরা জনসাধারণকে চিত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্পকলার প্রয়োজন বুঝাতে সক্ষম হন। দুটি পঁচাত্তরে থাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের। শিল্পীরা জীবনযাপনের অনেক কাজকে সুন্দর রূপ ও সুবাস দিচ্ছে গড়ে তুলতে থাকেন। ফলে ধীরে ধীরে শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন সংস্থায় চাকরির পদ হয়, কাজের পরিধি বাড়তে থাকে। আজ সমাজে একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন বিজ্ঞানী যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, একজন শিল্পীর প্রয়োজনও তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ। চিত্রশিল্পীরা সমাজজীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ব্যবসা ও প্রশাসন—সর্বক্ষেত্রেই আজ শিল্পীদের প্রয়োজন। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, সিনেমা তৈরিতে, বারের কাপড়ে ছবি, কার্টুন ও



চাহুকলা অনুবাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুন্দর প্রকাশনায়, বই পুস্তকের জন্য ছবি, প্রচারের জন্য পোস্টার তৈরিতে, বিজ্ঞাপনে, শিক্ষারখানার প্রবাসির আকার-আকৃতির নকশায়, শিল্পব্যবহার প্যাকেটের নকশায়, গোলাকশিষের নকশায়, কাপড় তৈরির শিখে, আসবাবপত্রের নকশায় এমনি অনেক প্রয়োজনীয় কাজে শিল্পীরা তাঁদের সৌন্দর্যবোধকে কাজে লাগাচ্ছেন।

১৯৪৮ সালে যাত্রা শুরু করে সেদিনের গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট অফ এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাবুলকা অনুষদ হিসেবে শিক্ষকতার বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদান করছে। ১৯৭১ পর্যন্ত একাটমাত্র শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর শিক্ষকতার ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করায় শিল্পীদের প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়। ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাবুলকা বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি চাবুলকা কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাবুলকা বিভাগ এবং সরকারি আর্ট কলেজ একত্রিত হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত রাজশাহী চাবু ও কাবুলকা মহাবিদ্যালয়টি বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে চাবুলকা বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে একটি চাবুলকা অনুষদ। ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে রয়েছে চাবুলকা বিভাগ। সমগ্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চাবুলকা বিভাগ। এছাড়া ইউনিস্টাসিটি অব ডেভেলপমেন্ট অস্ট্রেলিয়ার সিডনি (ইউডা) সহ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও দেওয়া হচ্ছে চাবুলকা শিক্ষা। তদুপরি ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, যশোর, নড়াইল, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন শহরে রয়েছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি আর্ট কলেজ। এছাড়াও শিশুদের ছবি আঁকার জন্য শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বাংলাদেশে এখন অনেক চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর রয়েছে। দেশে-বিদেশে শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকর্মের প্রদর্শনী হচ্ছে। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে গিয়ে বাংলাদেশের শিল্পীরা তাঁদের শিক্ষাকর্মের জন্য সুনাম ও দেশের জন্য গৌরব অর্জন করছেন। তাঁদের মূল্যবান শিক্ষার্কি বিখ্যাত জাদুঘর ও সংগ্রহশালায় সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষকলা একাডেমি জাতীয় তিস্তিতে বাংলাদেশের শিল্পীদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রতি দুই বছর পর পর আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক শিক্ষকলা প্রদর্শনী ও সম্মেলন। প্রদর্শনীর নাম-এশিয়ান বিয়েনাল বা এশিয়ান বিবার্ষিক প্রদর্শনী। অনেক দেশের শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। এই সফল এশিয়ান বিয়েনাল এর জন্য বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে বাংলাদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর আছেন। তাঁদের সবার কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পীর কথা সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হলো। অন্যান্যদের কথা ধীরে ধীরে জানতে পারবে।

পাঠ : ৮

শিক্ষার্থীর জয়নু আব্বাস

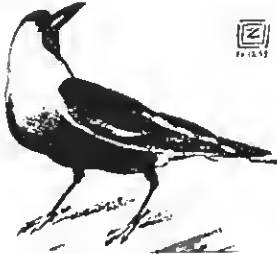
অনেক সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য ছবি একেছেন জয়নু আব্বাস। এগুলো এখন বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ এবং দেশে বিদেশে বিখ্যাত শিক্ষাকর্ম। এদেশে শিক্ষকলা চর্চার জন্য প্রথম যে প্রতিষ্ঠান আর্ট ইনস্টিটিউট-তার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন শিক্ষার্থীর জয়নু আব্বাস। তিনি বাংলাদেশের নামকরা অনেক শিল্পীকে হাতে ধরে ছবি আঁকা শিখিয়েছেন। শিল্পীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে তৈরি করেছেন। সমাজকে সুন্দরভাবে চালিত করতে শিল্পীদের প্রয়োজন তা এদেশের মানুষকে বুঝতে পেরেছেন। শিশু-কিশোরদের জন্য ছবি আঁকার স্কুল ও প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলাদেশের মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁকে ডালাবেসে নাম দিয়েছে শিক্ষার্থী।

শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম ২৯শে ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহে। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে ভর্তি হন কলকাতা আর্ট স্কুলে। ভালো ছাত্র হিসেবে অবদানেই সুনাম অর্জন করেন। আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষে সেখানেই শিক্ষকতার নিয়োগ পান। ১৯৩৮ সালে খুব ভালো কল করে তিনি উত্তীর্ণ হন।

তরুণ বয়সেই ছবি আঁকার প্রচুর ব্যক্তি অর্জন করেন জয়নুল। ১৩৫০ সালে বাংলার প্রথম সূর্য্যক দেখা দেয়। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের অবহেলা ও অমানবিকতার কারণেই সাধারণ মানুষের খাবারের অভাব হয়েছিল। কলকাতার রাস্তার হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ও অনাহার অবস্থা তরুণ শিল্পী জয়নুলের মনকে গীড়া দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি তার ভূষা জন্মাল— মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। মানুষের মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ অবস্থানকে বিবর করে আঁকলেন মোটা কাপো রেখার অনেক ছবি। যা পরবর্তীকালে সূর্য্যকের চিত্র নামে



শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন



পরিচিত হলো। রাতরাতি শিল্পীর নাম ছড়িয়ে পড়ল সার্ব ভারতে।

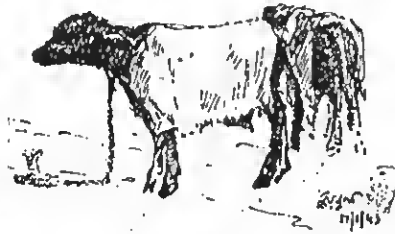
ভারতের বাইরেও অনেক উন্নত দেশে শিল্পী জয়নুলের সূর্য্যকের চিত্র বিবরে নামকরা পোকেরা পয়-পত্রিকায় উন্নত প্রশংসা করে লিখলেন। শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন বেঁচেছিলেন ৬২ বছর।

সবসময় কর্ম-সচল ছিলেন তিনি। হঠাৎ করেই দুরারোগ্য

জয়নুলের আঁকা 'কাক'

কৃষকদের ক্যালার গ্রোপে অকাত্ত হতে ১৯৭৬ সালের ২৮শে মে মৃত্যুবরণ করেন। শেষ বয়সে শোকশিল্পের আনুষঙ্গ্য গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছিলেন। বাংলার পুরোনো রাজধানী সোনারগাঁয়ে এই শোকশিল্পের আনুষঙ্গ্য। শূন্য করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি।

শিল্পচার্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলোর নাম— সূর্য্যকের চিত্র-১৯৪৩, সত্যায়, মই সেয়া, গল্প গাড়ি, পুনটানা, পাণ্ডতাল, দুমকার ছবি, প্রসাধন,



জয়নুলের আঁকা গরু

পাইনায় হা, মঝান (৬০ ফুট দীর্ঘ স্কল) মনপুরা-
৭০ (২০ ফুট দীর্ঘ স্কল)। স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিদ্য
করে একেছেন “মুক্তিযোদ্ধা” নামের ছবি। তাঁর ছবির
সত্তরহরমেছে জাতীয় জাদুঘরে, ময়মনসিংহ জরনুল
সত্যহাশার এক সেপে-বিসেপে ব্যক্তিগত ও
প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয়শালায়। শিলাচাঁব তাঁর সারা
জীবনে অনেক পুরস্কার, সম্মান ও প্রস্থা অর্জন
করেছেন। বিশ্বের বহু সেপে তিনি আমন্ত্রিত
হয়েছেন। পিতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি পিট উপাধি
সেন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপকের
সম্মান লাভ করেন।



শিলাচাঁব জরনুল আবহেলিসের আঁকা দৃষ্টিক-১৯৯০



জরনুল আবহেলিসের আঁকা দৃষ্টিক ১৯৯০-এর একটি ছবি

পাঠ : ৯

কামরুল হাসান

জীবনের শঙ্কান বছর সময়কাল তিনি
অসম্ভব ছবি একেছেন। প্রতিদিনই তিনি
ছবি আঁকতেন। আর একটি সূচি নয়,
অনেক। একটা হিসাব বরা হাক-
প্রতিদিন ৫টি করে ছবিই করলে ৫০ বছরে
সাঁড়ান প্রায় ১ লক্ষ ছবিই। ইয়া, তাঁর মতো
এত বেশি ছবিই সারা বিশ্বের আর কোনো

শিল্পী করেছেন কিনা জানা যায়নি। ছবি-এ তাঁর দক্ষতা তুলনাবীন। আর্ট
ইনস্টিটিউটের তিনিও একজন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। প্রথম জীবনে খুবই নিষ্ঠা
নিরে অনেক শিল্পীকে গড়ে তুলেছেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে
তোলেন নকশা কেন্দ্র। নকশা কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। একমল শিল্পী নিয়ে
অসম্ভব নতুন নতুন নকশা তৈরি করেন তাঁতিদের জন্য ও অন্যান্য
কাল্পনিকীদের জন্য।

জন্ম ২রা ডিসেম্বর, ১৯২১ কলকাতায়। কলকাতা আর্ট স্কুলে ডিব্রুগড়
শিক্ষা লাভ করেন। তরুণ বয়সেই ব্রজনাথী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।
১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্রজনাথী
আন্দোলন হলো ঝাঁটি ব্যঙাশি হিসেবে নিজেকে তৈরি করা এবং অন্যকেও

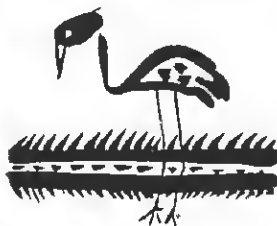


কামরুল হাসানের আঁকা নিজের মুখ

উদ্ধৃদ্ধ করা। অন্যদিকে শিশু-কিশোরদের খাতি বাতালি ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ‘মুকুল ফৌজ’ গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন মুকুল কৌজের সর্বাধিনায়ক (১৯৪৬-৫১)। শরীর চর্চায়ও তার সুনায ছিল। সুন্দর সেহ ও সু-স্বাস্থ্যের জন্য-১৯৪৫ সালে মিঃ বেজল উপাধি ও পুরস্কার লাভ করেন।



কামরুল হাসানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আঁকা ছবি-ইয়াহিয়ার জানোয়ারের মতো মুখ। এটি একটি পোস্টারচিত্র। যার মধ্যে দেখা গেল এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে। ইয়াহিয়ার মুখ জানোয়ারের আকৃতির। যে লক্ষ লক্ষ বাঙালির হত্যার হোতা। তার এই পোস্টারচিত্র আঁকার গুণে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ছিল উৎসাহ ও প্রেরণার এক জম্ম। তাই একটি ছবিই কাজ করেছে অস্ত্রের-লক্ষ মেশিনগানের।



কামরুল হাসানের আঁকা : ছেলে ও গাধা



কামরুল হাসানের একটি ছবিই : ঘোড়া



কামরুল হাসানের বিখ্যাত পোস্টারচিত্র মুক্তিযুদ্ধ-৭১ এর জন্য আঁকা

কামরুল হাসান তাঁর ছবি আঁকা, লেখা, কল্পিতা অর্থাৎ সব রকম কাজের মধ্য দিয়ে অনায়াস ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। কবিরের এমনি এক প্রতিবাদী কবিতার সভায় সভাপতিত্ব করার সময় ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি হুমদাতের ক্রিয়া কক্ষ হয়ে অনুষ্ঠানের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন। কামরুল হাসান বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রূপকার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের নকশা নির্মাণ করেন। সারা জীবনে তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক সম্মান, শ্রুতি ও পুরস্কার পেয়েছেন।

তাকে একশ পদকে ভূষিত করা হয়। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলো হলো নবান্ন, উর্কি দেয়া, তিনকন্যা, বাংলার রূপ, জেলে, গ্যাচা, নাইওর, শিয়াল, বাংলাদেশ, গণহত্যার আগে ও পরে ইত্যাদি। তাঁর অনেক ছবি সংগ্রহ রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে।

পাঠ : ১০

আনোয়ারুল হক

শিল্পকার একজন নিবেদিত গ্রাফ ও শিক্ষক হিসেবে শিল্পী আনোয়ারুল হক খ্যাতি অর্জন করেন। প্রতিটি ছাত্রকে তিনি হাতে ধরে শেখাতেন। তাঁর সারা জীবন কাটে চারুকলা ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করে। তিনি কয়েকবার চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ফাঁকে ফাঁকে কিছু চিত্রকলা করে রেখে গেছেন। জলরঙে সুন্দর ছবি আঁকায় তাঁর খ্যাতি ছিল।

তিনি জনগ্রহণ করেন অস্ত্রিকার উপাডায়। ছেলেবেলা সেখানেই কাটে। শিল্পকলা শিক্ষাগ্রহণ করেন কলকাতা আর্ট স্কুলে। তারপর সেখানেই তরুণ বয়সে শিক্ষকতায় যোগ দেন। তারপর ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকতা করে গিয়েছেন। তিনি ১৯৮২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।



শিল্পী আনোয়ারুল হক

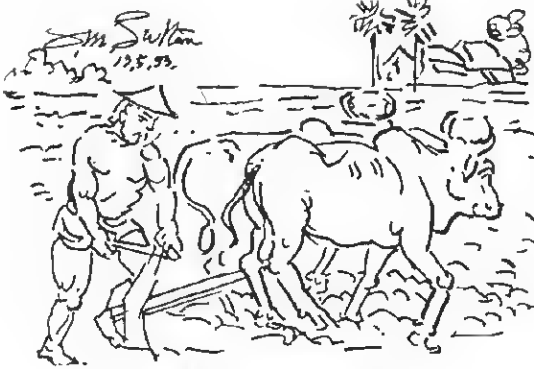


সুলতান নিজেই একেছেন নিজের প্রতিকৃতি

পাঠ : ১১

এস. এম. সুলতান

একজন খেয়ালী মানুষ ও বৈশিষ্ট্যময় চিত্রকলার শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর ছবির বিষয় বাংলাদেশের গ্রাম জীবন, চাষ-বাস, কৃষক, জেলে ও খেটে খাওয়া মানুষ। তাঁর ছবির মানুষেরা বাস্তবের মতো নয়। বলিষ্ঠ সেহ ও শক্তিশালী। তাঁর আঁকার গুণে ছবি বুঝতে কান্ড কঠ হয় না। তিনি তাঁর ছবির মানুষকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, যে কৃষক-জলকে আমরা দেখি-তাদের বাইরের রূপ, তন্ন আখ্যা দুর্বল শরীর। আসলে তো তা নয়। কৃষককুল জমি কর্ষণ করে, ফসল ফলায়, খাদ্য জোগায়। তারাই তো আসলে দেশের শক্তি। তাদের ভেতরের বৃগা শক্তিশালী। সুলতান



শিল্পী এস. এম. সুলতানের তাঁকা হালচাষ

জন্মগ্রহণ করেন নড়াইলে ১৯২৩ সালে। তাঁর ছেলেবেলা কাটে গ্রামে। তারপর ছবি আঁকা শেখেন কলকাতা আর্ট স্কুলে। তারপর বের হয়ে পড়েন— যুরোপ বেড়ান দেশ-বিদেশে। ছবি আঁকেন, মাঝে মাঝে প্রদর্শনী করেন আবার উদ্দেশ্যহীন ভাবধুরে জীবন। ভারত, পাকিস্তানের অনেক অঞ্চল ঘুরেছেন।

ঘুরেছেন ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশ। বেশ-ভ্রমণ ছিল অন্য সবাই থেকে আলাদা। লম্বা চুল, কখনো পা পর্যন্ত কাশো আলমোদা পরা, কখনো গেরুয়া রঙের চাদর সারা গায়ে ছড়িয়ে, কখনো মেয়েদের মতোই শাড়ি ও চুড়ি পরে ফুরেছেন। সন্ন্যাসীর মতোই জীবন কাটিয়েছেন। শেষ বয়সে নড়াইলে নিজের জন্মস্থানে বসবাস করেন। শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার স্কুল করেন। নাম শিশুশ্রম। শিশুরা লেখাপড়া করবে। ছবি আঁকবে, গান গাইবে, প্রকৃতি, গাছপালা, জীব-জন্তুর সাথে আপন হয়ে মিশে যাবে। মনের আনন্দে সব শিখবে। জেজর করে মর। সুলতান অনেক পশু-পাখি পাশতেন। নিজের সভ্যতার মতো সে সব পশু-পাখিকে যত্ন করতেন। ১৯৯৪ সালে নড়াইলেই একাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর চিত্রকর্ম বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে ‘রেসিডেন্ট আর্টিস্টের’ সম্মান প্রদান করেন। তিনি স্বাধীনতা পদক লাভ করেন।

পর্চ : ১২

শফিউদ্দিন আহমেদ

শিল্পকলার একজন আদর্শ শিক্ষক। পরিচ্ছন্ন রুচি, মার্জিত স্বভাব এবং দক্ষ চিত্রশিল্পী হিসেবে সুনাং অর্জন করেছেন। ছাশিট্রে, বিশেষ করে কাঠ খোদাই, এটিং, একোয়ালিটি, ড্রাই-পয়েন্ট ও ডিম এটিং মাধ্যমে একজন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী। আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা থেকেই শিক্ষকতা করেছেন। বাংলাদেশের অনেক খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীকে তাঁর মেধা, শিল্প চেতনা, শিক্ষা দিয়ে শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। শফিউদ্দিনের জন্য কলকাতার ১৯২২ সালে। ছবি আঁকা শেখেন কলকাতা আর্ট স্কুলে। তারপর কিছুদিন সেখানেই শিক্ষকতা করেন। তত্ত্ব বয়সেই তাঁর কাঠ খোদাই ছাপটিয়ের জন্য

সারা ভায়তে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সে সব চিত্রগুলো হলো সাঁওতাল মেয়ে, গ্রামের পথে ইত্যাদি।

শিল্পী শফিউদ্দিন আহমেদ ডেলরঙের অনেক ছবি একেছেন। ছাপ পদ্ধতির চিত্রে যে সব বিষয়ে ছবি একেছেন সেগুলো হলো—কন্যার উপর ছবি, জেলে, জাল ও মাছ বিয়ক ছবি, নৌকা, কড় ইত্যাদি নিসর্গচিত্র ও ‘ড্রেশ’ বিষয়ে চিত্রকলা। শিল্পাচার্য অরদুল আবেদিন তাঁর সম্মার্কে মন্তব্য করেছেন—‘শিল্পকর্মের মান বিচারে অর্থাৎ কোন ছবিটি ভালো এবং কোনটির মান উত্তীর্ণ তা সঠিকভাবে বিচার করতে পারেন শিল্পী শফিউদ্দিন আহমেদ। জীবনে অনেক পুরস্কার ও সম্মানসহ একশ্রেণি পদক অর্জন করেছেন। ২০শে মে ২০১২ তারিখে এই প্রতিভাবান শিল্পী প্রয়াণকামন করেন।



শিল্পী শফিউদ্দিন আহমেদের কঠি খোলাই চিত্র—সাঁওতাল

পৃষ্ঠ : ১৩

কাজী আবুল কাশেম

একজন সফল পুস্তক চিত্রশিল্পের শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে বই, পত্রপত্রিকার প্রচ্ছদ ও ইলেক্ট্রেশন (ছবি) তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ। ‘দোপেয়াজা’ ছদ্মনামে রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্টুন একে খ্যাতি লাভ করেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য লিখেছেন এবং শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। তাঁর জন্ম ১৯১৩ সালে করিমপুরে। ছবি আঁকা শিখেছেন নিজের ডেকার—কোনো আর্টস্কুলে পড়ার সুযোগ পাননি। শিশুদের বইয়ে ছবি আঁকার জন্য কলেক্টর জাতীয় গ্রান্টকেব্রু থেকে পুরস্কৃত হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন।



১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে এই কার্টুন একেছেন ‘দোপেয়াজা’ বা শিল্পী কাজী আবুল কাশেম

বাংলাদেশের শিল্পকলার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করেছেন এমন শিল্পীর সংখ্যা এখন অনেক। তাঁদের কয়েকজনের কথা এখানে আলোচনা হলো। তাঁদের সমসাময়িক আরও যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন শিল্পী শাজা শফিক আহমেদ, শফিকুল আমিন, হাবিবুর রহমান, সৈয়দ শফিকুল হোসেন প্রমুখ।

এঁদের পরে যে সব শিল্পীরা চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ও অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা হলেন শিল্পী মোহাম্মদ কিব্রীয়া, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বণীর, রশীদ চৌধুরী, আবদুর রাস্তাক, দেবদাস চক্রবর্তী, হামিদুর রাহমান, নভেরা আহমেদ, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত, লিটুন কুন্ডু, জোনাবুল ইসলাম, মীর মোস্তফা আলী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, আবু তাহের, গোলাম সারোয়ার, মাহমুদুল হক, কালীদাস কর্মকার, হামিদুল্লাহমান খান, কাজী গিয়াস, স্বপন চৌধুরী, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, মনিরুল ইসলাম, আবুল বারক আলভী, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সাত্তার, অলক রায়, মনসুরুল করিম, কে এম এ কাইয়ুম, ফরিদা জামান, শওকাতুল্লাহমান, শামীম আরা শিকদার, রনজিৎ দাস প্রমুখ।

পাঠ : ১৪

আমাদের শিল্পকলায় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

আমাদের শিল্পকলায় ঐতিহ্য মূলত আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থেকে এসেছে। আবহমান গ্রাম বাংলার বৈচিত্র্যময় জীবন আর আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সমন্বয় করে গড়ে উঠেছে আমাদের শিল্পসংস্কৃতি। এদেশের চিত্রশিল্পের পথিকৃৎ জয়নুল আবেদিন তাই তাঁর চিত্রের মাঝে ভুলে ধরেছেন লোকজ কর্মে সাধারণ মানুষের সরলতা, শৃঙ্খলতা। শোকশিল্পের তিনি যেসব ফর্ম আবিষ্কার করেছেন, সেসবের দেখা মেলে তাঁর ঝাঁকা তিন মহিলা, গুনটানা, বাংলাদেশের মেয়ে, মাখি ইত্যাদি ছবিতে। প্রকৃতির রূপ তার কাছে দ্রুশ, কোমল। বাইরের পৃথিবী তাঁর কাছে ধরা দেয় কোমলতা ও সুষমতার ভিত্তিতে। তাঁর সহযোগী শিল্পী কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক কিংবা এস. এম. সুলতানসহ অনেকেই এ ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কামরুল হাসান তাঁর ছবিতে বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্যকে ভুলে ধরেছেন। লোকজ রীতি গ্রামে, মানুষের মনে, স্মৃতিতে, পুরোনো কাহিনীতে জীবন্ত। আর তাকে নির্মাণ করে কামরুল হাসান ছবি ঐকেছেন। কামরুল হাসানের ঝাঁকা সরা, শখের ইঁড়ি, পুতুল এবং তাঁর চিত্রকলা তিনকন্যা, নাইওর এসব ছবির মাঝে বাংলায় প্রাচীন লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য ঝুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর ছবিতে লোকজ জীবনের আভাস ফুটে ওঠে। চড়া রং ব্যবহারের সঙ্গে তাঁর প্রকাশভঙ্গিও ছিল লোক ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। কামরুল হাসান তাঁর ছবিতে পূর্বের ফর্ম ভেঙে নতুন সময়ের সঙ্গ ও যন্ত্রণা, আশা ও হতাশাকে ঐকেছেন।

বালা, বাঙালি এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের জীবনের ধারা ঝুঁজে পাওয়া যায় আর এক মহান শিল্পী এস. এম. সুলতানের ছবিতে। তাঁর ছবি বস্তুদের মতো নয়। তাঁর ছবির মানুষগুলো বাইরের রূপের চেয়ে তাঁর অন্তর্নিহিত যে রূপ অর্থাৎ কৃষককুল, যাদের প্রেমের বিনিময়ে জীবনধারণ করি আমরা, তাঁদেরকে তিনি ঐকেছেন শক্তিমান ও পেশিবল্ল মানুষ হিসেবে।

রশিদ চৌধুরীর চিত্রকলায় আমাদের শিল্পকলায় ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে একটু ভিন্নভাবে। রূপকথা, লোককথা, কুসংস্কার, পুথির পথ ধরে তিনি যে প্রতীক গড়ে তুলেছেন তাতে মিশে আছে কল্পনার জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও পশু-পাখির জগৎ। তার ঝাঁকা হাতি, ঘোড়া, পাখি, ময়ূর, মোরগ সবই যেন লোককথা ও রূপকথায় বিস্তৃত। ট্যাপিস্ট্রিতে বহু কাজ

করেছেন তিনি। এদের ধারাবাহিকতায় শিল্পী কইয়ুম চৌধুরী, যশেশ খান ও অন্যান্য শিল্পীরাও চিত্রকলায় ঐতিহ্যকে জুড়ে ধরেছেন। অন্যদিকে লোকজ ধারার কাজ করে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাটকে বিবয় করে পাশেট শিল্পকে জনপ্রিয় করেছেন শিল্পী মুস্তাকা মনোয়ার।

বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ইতিহাসের কসল। ভিত্তি তার কৃষিজ, প্রকাশ তার বিভিন্ন। মক্কাশিকখাঁ, সারা, পুতুল, শীতলপাটি, খাঁড়ি, বৈশ ও বেতের কাজ হচ্ছে লোকজ শিল্প বা আমাদের ঐতিহ্যের হুণ। তার এর সাথে আছে আমাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস।

শিল্পকলার এই যে ঐতিহ্য এটা যেমন হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার চলে এসেছে, তেমনি বাহাদুর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, আমাদের লাল সবুজ পতাকা। ভিরিগ লক্ষ শহিদের তরঙ্গের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাভূত্বুযি। অপামর

জনসাধারণের সাথে আমাদের প্রতিভাবশা চিত্রশিল্পীরাও সেদিন তাঁদের রং-তুশি দিয়ে পোস্টার, কেস্টন, প্রাকার্ডে তদানিন্তন স্বাধীনতা বিরোধী পশ্চিমাগোষ্ঠী হায়েনাদের হুগটি জুড়ে ধরে উজ্জীবিত করেছিলেন এদেশের মুক্তিকামী মানুষদের। যার নিদর্শন হিসেবে আমরা দেখতে পাই কামরুল হাসানের সেই বিখ্যাত পোস্টার ইয়াহিয়ায় ছবি সম্বলিত লেখা 'এই জায়েদারদের হত্যা করতে হবে'। তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এদেশে যেসকল ভাস্কর্য বিশেষ করে বঙ্গভাস্কর্যে বাংলা, সোপার্জিত স্বাধীনতা, শাবাশ বাংলাদেশ, জাঙ্গত টোরঞ্জি, সংসদক এবং শহিদমিনার, মুক্তিবৌদ্ধহ বাংলাদেশের নানান জায়গায় যেসকল ভাস্কর্য ও মুক্তিযুদ্ধ তৈরি হয়েছে, তার মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-যা হুণ হুণ ধরে এ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জুড়ে ধরবে। মুক্তিযুদ্ধ এবং এর ফলে বাংলায় হাজরা পরিমিতভাবে আমাদের শিল্প- সাহিত্যের অঙ্গানে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আমাদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও সংগীতের মতো চিত্রকলার ক্ষেত্রেও মুক্তিযুদ্ধ এসেছে তার বহুমাত্রিক হুণ নিয়ে। আমাদের শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধকে বিবয় করে অজস্র শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন এবং করছেন।

কাজ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ফেনব ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে, তাদের কয়েকটি নাম লেখ।



রাষ্ট্রপাঠী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত শিল্পী নিতুন কুন্ডুর নির্মিত ভাস্কর্য 'শাবাশ বাংলাদেশ'

નમૂના ઇશ્ત

वह्निर्वाचनि अन्न

- ১। “সোপেয়াজা” কোন শিল্পীর ছদ্মনাম ?
ক. রফিকুন নবী খ. হাশেম খান
গ. কাজী আবুল কাশেম ঘ. মুক্তাফা মনোয়ার
- ২। “এই জাণোয়ারদের হত্যা করতে হবে” শিরোনামে গোষ্ঠারটি কে অঙ্কন করেন ?
ক. কাইয়ুম চৌধুরী খ. কামরুল হাসান
গ. প্রাণেশ মন্ডল ঘ. নিতুন কুণ্ডু
- ৩। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা “নবান্ন” ছবির দৈর্ঘ্য কত ছিল ?
ক. ৭০ ফুট খ. ৭৫ ফুট
গ. ৬৫ ফুট ঘ. ৬০ ফুট
- ৪। চারুকলা অনুঘদ কত সালে প্রতিষ্ঠা হয় ?
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৫৭ সালে
গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯৭০ সালে
- ৫। “মই দেয়া” ছবিটি কে অঙ্কন করেন ?
ক. শিল্পী কামরুল হাসান খ. শিল্পী মৃত্তিকা বশীরা
গ. হাশেম খান ঘ. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
- ৬। রেমব্রাণ্ট কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন ?
ক. জার্মানিতে খ. লাতভে
গ. ইটালিতে ঘ. হল্যান্ডে
- ৭। “The Dance” চিত্রটি কোন শিল্পীর শিল্পকর্ম ?
ক. মতিস খ. রেমব্রাণ্ট
গ. পাবলো পিকাসো ঘ. পল সেজান
- ৮। আধুনিক চিত্রকলায় জনক কে ?
ক. পল সেজান খ. পাবলো পিকাসো
গ. মতিস ঘ. ভ্যান গঘ
- ৯। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট -এ প্রথম বর্ষে কতজন ছাত্র ছিল ?
ক. ১২ জন খ. ১৫ জন
গ. ১৪ জন ঘ. ১৩ জন
- ১০। “ শিশুস্বর্ণ ” কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
ক. এস.এম. সুলতান খ. কামরুল হাসান
গ. শফিউদ্দিন আহমেদ ঘ. আনোয়ারুল হক

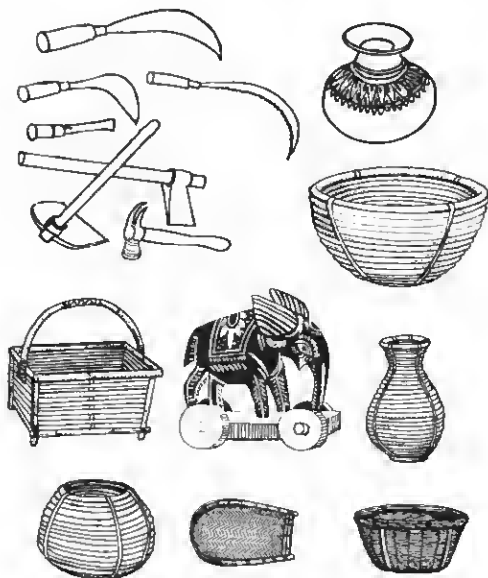
শিখে ছবাব দাও

- ১। বাংলাদেশে চিত্রশিল্পী ও শিল্পকলার ভূমিকা সম্পর্কে যা জানা লেখ।
- ২। শিল্পচার্য কাকে বলা হয়? তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে লেখ।
- ৩। ব্রতচারী আন্দোলন করেছিলেন কোন শিল্পী? তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।
- ৪। শিল্পকলার একজন নিবেদিত গ্রাণ হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। কে তিনি? তাঁর সম্পর্কে লেখ।
- ৫। তিনি শিল্পকলার মান সঠিকভাবে বিচার করতে পারেন। কোন শিল্পী সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে? তাঁর বিষয়ে বিস্তারিত লেখ।
- ৬। ‘শিশু স্মরণ কী? কোন শিল্পী শিশু স্মরণ তৈরি করেছেন? শিল্পী সম্পর্কে যা জানা লেখ।
- ৭। বাংলাদেশের খ্যাতিমান ১২ জন শিল্পীর নাম লেখ। ঐদের মধ্যে যে কোনো একজন সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।
- ৮। আধুনিক চিত্রকলার জনক প্যল সেজান সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।
- ৯। শিল্পী রামকিঙ্করদের বেইজের কাজের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখ।
- ১০। রামকিঙ্করকে প্রাচ্যের আধুনিক ভাস্কর্যের জনক হিসেবে মূল্যায়ন কর।
- ১১। বিশ্বে আধুনিক ভাস্কর্য হিসেবে রদীয়ার কাজের বৈশিষ্ট্য লেখ।

সংক্ষেপে ছবাব দাও

- ১। শিল্পকলা শিকার প্রথম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এমন ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীর নাম লেখ।
- ২। শিল্পকলা শেখার প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম কী? কোন সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়?
- ৩। সমাজ স্তরবনের কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পকলার শিল্পীদের প্রয়োজন?
- ৪। ‘এই জ্ঞানোয়ারদের হত্যা করতে হবে’ শীর্ষক ছবিটি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
- ৫। আধুনিক ভাস্কর্যের জনক কে? তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
- ৬। দোপেয়াজা কী বা কে? সংক্ষেপে লেখ।
- ৭। রেমব্রাট সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়
বাঙালি লোকজীবনে চারু ও কারুকলা



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাংলার গ্রামীণ জীবনে চারু ও কারুকলার প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন পেশায় চারু ও কারুকলার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- লোকজীবন সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্পকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে ও উদাহরণ দিতে পারব।

পাঠ : ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬

লোকায়ত বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি

লোকজীবন হলো মানুষের জীবন। সেই মানুষ যখন কাঙ্ক্ষাশি- অর্থাৎ যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি এবং বাংলায় অনুগ্রহণ করেছে, স্বাধীনভাবেই বাংলাদেশ নামক অঞ্চলে বসবাস করছি তাদের জীবনযাপনে স্বাভাবিকভাবে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য হলো চারু ও কাবুলকার ব্যবহার ও অন্যান্য সংস্কৃতি। তবে অঞ্চলভিত্তিক লোকজীবনে কিছু তিন তিন বৃণ রয়েছে। যেমন- গ্রামের জীবনযাপনে এবং শহরের জীবনযাপনে বৈপরিত্য রয়েছে। আবার গ্রামের জীবনযাপন ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণে পোশাক-পরিচ্ছদে বিভিন্নতা, ঘরবাড়ি তৈরিতে বিভিন্নতা, চাষাবাস ইত্যাদিতে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। আবার মিলও আছে অনেক। আদিবাসী ও ক্ষুদ্র দু-গোষ্ঠীর লোকজীবনেও চারু ও কাবুলকার ব্যবহার অনেক। কিছু উদাহরণ উল্লেখ করলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। শহরের ঘরবাড়ি বেশিরভাগই ইট, গোহা ও কাঠের তৈরি। আজকাল যথাযথ পুঁজু দিয়ে আসবাবপত্র এবং বসবাসের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো একটির সঙ্গে আরেকটির সামঞ্জস্য করে তৈরি করা হয়। খাওয়া দাওয়ার টেবিল, চেয়ার, খাট, পাশ, আলমারি, পোশাক-পরিচ্ছদ রাখার মেয়াল, আলমারি, বই রাখার আলমারি, সোফাসেট, দরজা, জানালা সর্বত্রই চারু ও কাবুলকার প্রতিফলন ঘটানো হয়। নানারকম নকশা করে এসব আবাসিক বস্তুসামগ্রীর শিল্পরূপ দেয়া হয়। কাঠের দরজা, জানালা ও খাট পাশ-এ কাবুলশিল্পীরা খোদাই করে ফুল, পানি, লতাগাভা ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। আবার কিছু দরজা ও অন্যান্য আবাসিক জ্যামিতিক নকশা ও রেখার সমন্বয়ে শিল্পরূপ দেয়া হয়। দরজা-জানালায় যে সব পর্দা টাঙানো হয় তার রং, নকশার ছাপ, লতাগাভা ও প্রাকৃতিক দৃশ্য চারু ও কাবুলশিল্পীরাই ফুটিয়ে তোলেন। কখনো ভীতি বুননের মাধ্যমে কখনো কাবুলশিল্পী নানারকম কাঠ ও রবারের ব্লক তৈরি করে ছাপ তুলে তা করে থাকেন। বাড়িঘরের অন্যান্য সাজসজ্জায় সর্বত্রই চারু ও কাবুলশিল্পীদের কাজ ব্যবহার করা হয়। যেমন- চিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতি, বর-কনে, প্যাঁচা, পানি ইত্যাদি। টেরাকোট্টা ফলক, পোড়ামাটির ছোট বড় টেপা পুতুল, হাতি, ঘোড়া মানুষসহ পোড়ামাটির ফুলদানি, নানা আকার ও আকৃতির পাত্র, শখের হাড়ি, লাক্ষীসরা, পাটের শিকা, থলে ও অন্যান্য কাবুলশিল্প নকশাকীর্ণা ইত্যাদি। এসব শিল্পকর্ম বেশিরভাগই বাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা করে থাকে। কিছু তৈরি হয় চারু ও কাবুলকা চর্চার স্বাভাবিক কারণে ও স্বতাবগত অভ্যাসে। আমরা এসব শিল্পকে তাই নাম দিয়েছি লোকশিল্প। আবার জীবনযাপনের প্রয়োজনে- বঁশ, বেত, পাট ইত্যাদি উপকরণে এবং মাটির ইড়ি-পাতিল যারা বানান গোহা, পিতল, কঁসার বিভিন্ন ব্যবহারিক বস্তুসামগ্রী যারা তৈরি করেন (দা, ছড়াল, লাঙল, কোদাল, থলাবাটি, কলসি ইত্যাদি) তাঁদের নাম কাবুলশিল্পী।

বর্তমানে লোকশিল্প ও কাবুলশিল্পের বিশেষ কিছু বস্তুসামগ্রী বাণিজ্যিকভাবে দেশে-বিদেশে বিস্তারের জন্য শহরে বিশেষ ব্যবস্থায় তৈরি হয়ে থাকে।

প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত চিত্রশিল্পীদের ঐকো চিত্রকর্ম দেখালে টাঙ্কিয়ে এবং ভাস্করদের তৈরি সিমেন্ট, পাথর, ব্রোঞ্জ ও কাঠের ছোট ভাস্কর্য সাজিয়ে চারু ও কাবুলশিল্পকে সুন্দর জীবনযাপনে প্রয়োজনীয় করে তোলা হচ্ছে।

গ্রাম : গ্রামের ঘরবাড়ির আসল শহর থেকে যথেষ্ট তিন। পেশাগত ও অর্থনৈতিক কারণে গ্রামের ঘরবাড়ি তৈরি হয় মাটি, কাঠ, টিন, ছন, পাটবাড়ি, খড়, গোদপাতা, নারকেলপাতা ইত্যাদি দিয়ে। গ্রামের কৃষিকীর্ষী মানুষ, জেল, মাঝি, কামার, কুমার তাঁরাই নিজেদের প্রয়োজনমতো এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের বসবাস উপযোগী ঘরবাড়ি তৈরি করেন। নিজেরা স্থাপত্যকলার পারদর্শী না হলেও স্বাভাবিক চিন্তায় এসব ঘরবাড়িতে গ্রামের পেশাকীর্ষী মানুষের

যর্ম্মা-৫, চারু ও কাবুলকা-৯ম-১০ম

শিল্পবোধের ও সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দোচালা ঘর, চৌচালা ও আটচালা ঘরবাড়িতে বাঁশ, বেত ও কাঠের নানারকম শিল্পকর্মের মাধ্যমে চারু ও কারুকলার প্রকাশ ঘটে।

ঝড়, বন্যা, ইত্যাকার প্রাকৃতিক সূর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজকাল গ্রামেও ইটের ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে। দালালকোঠা হলেও শহরের মতো না হয়ে গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে মনে রেখে সেগুলো তৈরি হয়।

গ্রামের লোকজীবনে যেসব পেশা রয়েছে— তাদের জীবনযাপনে যেসব বস্তুসামগ্রী প্রয়োজন হয় তাতে কম বেশি চারু ও কারুশিল্পের প্রয়োগ দেখা যায়। এসব বস্তুসামগ্রী শহুরে জীবনেও কিছু কিছু ব্যবহার হয়ে থাকে। যা আগে উল্লেখ করেছি। যেমন দা, কুড়াল, কোদাল, কাস্তে, খত্তা, লাঙ্গল, জোয়াল, মই এগুলো কামারেরা লোহা গিটিয়ে তৈরি করে। জোয়াল ও মই অবশ্য কাঠ ও বাঁশের তৈরি। বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় ছোট বড় নানা আকৃতির ঢুকরি, কুলা, বাঁকা, খালুই, মাছ ধরার চাই। মাছ ধরার চাই তৈরিতে চারু ও কারুকলার প্রকাশ বেশ সুন্দর। কারুশিল্পের উন্নত নিদর্শন হিসেবে চাই সমাদর পেয়ে এসেছে। মূর্তা গাছের বাকল দিয়ে তৈরি হয় শীতলপাটি। পাটিতেও কারুশিল্পীরা বুনের মাধ্যমে নকশা ও চিত্র ঘটিয়ে তোলেন।

বাংলাদেশের আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন অঞ্চলে। রাজশাহী, দিনাজপুর অঞ্চলে রয়েছে সীতাল, ভঁরাও ও রাজবংশীরা। ময়মনসিংহে, নেত্রকোনা, শেরপুরে বসবাস করে গারো ও কোচ। খাসিয়া, মনিপুরী, ত্রিপুরারা বাস করে সিলেট অঞ্চলে। বরিশালে বাস করে রাখাইন সশ্রদারের মানুষ। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে রয়েছে অনেক আদিবাসীদের বসবাস। এরা হলো— চাকমা, মারমা, তনেছকা, বম, বোমাং, ত্রিপুরাসহ আরো অনেক। এরা উঁচু নিচু পাহাড় ও পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে। পরিবেশের সঙ্গে ভাল মিলিয়ে এরা নিজেদের বসবাসের ঘর তৈরি করে। যা স্থাপত্য ও কারুশিল্পের সুন্দর প্রকাশ। এরা চাষবাস করে চালু পাহাড়ের গায়ে। চাষের পদ্ধতির নাম জুম চাষ। নিজেরাই বিশেষ করে মেয়েরা ঘরে বসে তাঁতে নিজেদের পরিধেয় পোশাক তৈরি করে। আদিবাসীদের লোকজীবনে সর্বত্রই চারু ও কারুকলার প্রকাশ বিদ্যমান।

বাংলাদেশে চারু ও কারুকলার চর্চা বিভিন্ন শিল্পবস্তু তৈরি এবং শৈল্পিক বস্তুসামগ্রীর ব্যবহার পোকারয়ত। অর্থাৎ জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালিরা চারু ও কারুশিল্পীদের তৈরি করা বস্তুসামগ্রী জ্ঞাতি, ধর্ম ও গোত্র নির্বিশেষে সবাই ব্যবহার করে এসেছে। সব ধর্মের মানুষই শিল্পকর্ম তৈরি করে থাকে।

বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। সাধারণ মানুষ অসাম্প্রদায়িক। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ধর্মের মানুষ পাশাপাশি একই সঙ্গে বসবাস করার ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। একে অপরের কাছে সহযোগী। তাগাভাগি করে অনেক কাজই সমাধা করে বিভিন্ন ধর্মের প্রধানরা।

একজন হিন্দু কামারের তৈরি—দা, কুড়াল, খত্তা, কাঁচি ইত্যাদি মুসলমান, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধরা নির্বিধায় ব্যবহার করে। একজন কুমার—যে হিন্দু ধর্মের মানুষ, তাঁর তৈরি মাটির ইঁড়ি—পাতিলে রান্না করে যেতে মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মের মানুষের কোনো আপত্তি নেই। তাঁর তৈরি মাটির কলসি থেকে সবাই আনন্দের সঙ্গেই পানি পান করে।

আদিবাসী মেয়েরা তাঁতে তাদের সুন্দর পোশাকের কাপড় বুনে নেয়। রং, নকশায় ও বৈচিত্র্যে আদিবাসীদের তৈরি কাপড় ও পোশাক সমভঙ্গের সব ধর্মের মানুষদের কাছেই আকর্ষণীয়। বিশেষ করে তাদের তৈরি চাদরের কদর সারা বাংলাদেশে। সেই চাদর গায়ে জড়িয়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সব লোকই সমান আরাম পায় এবং ঠাণ্ডা থেকে সমানভাবেই রেহাই পায়। সোনা, রূপার অলঙ্কারে নিহুঁতভাবে নকশা খোদাই করার কাছে বাংলাদেশের কারুশিল্পীরা

ব্যক্তি অর্জন করেছে। সবধর্মের মানুষের মধ্যেই অলঙ্কার শিল্পের কারিগর বা কারুশিল্পী রয়েছে। একজন মানুষ অনেক ইচ্ছা ও অনেক বেছে তার পছন্দের অলঙ্কারটি সঞ্চার করে। তার পছন্দ, হুচি ও শিল্পবোধই তাকে বাছাই করতে সাহায্য করে। তার বাছাই করা অলঙ্কারের নিখুঁত নকশা খোদাই ও সুন্দর কারুকাজের জন্য তিনি অলঙ্কার শিল্পীকে সম্মান দেখান— প্রশংসা করেন। শিল্পের জন্যই তিনি কারিগরকে প্রশংসা করেন। অন্য কোনো কারণে নয়।

বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক কয়েকটি উৎসব হয়ে থাকে। যেমন— মুসলমানদের ঈদ উৎসব, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমা, খ্রিস্টানদের বড়দিন। ধর্মভিত্তিক হলেও অন্যান্য ধর্মের মানুষ নানাভাবে সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশের প্রায় ৯৯ ভাগ মানুষ বাংলাভাষায় কথা বলে। আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা আছে। তা সত্ত্বেও তারা বাংলা ভাষায়ও কথা বলে। এই বাংলাভাষার কারণে আমাদের সাহিত্য, গান, নাটক, যাত্রাপালা এবং অন্যান্য সংস্কৃতি লোকায়ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান। সব ধর্মের মানুষদের মধ্যেই তা বিস্তৃত। চারু ও কাবুলকা বিষয়টিও সমানভাবে লোকায়ত।

সৈরাচরী পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালিরা একতাবদ্ধ হয়ে ২৩ বছর ধরে সত্যাগ্রহ করেছে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য। বাঙালিরা বাংলাভাষা, চিরায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও লোকায়ত বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে বিজাতীয় ভাষা, পাকিস্তানি উদ্ভট সংস্কৃতি তথা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা জোরজুলুম করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার বাঙালিরা এক হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭১ সালে সামান্য যুদ্ধাস্ত্র নিয়েই পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। নয় মাস যুদ্ধ করে বিপুল অস্ত্রসম্পদে সম্বলিত শক্তিশালী পাকিস্তান সেনাদের পরাস্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। বাঙালির লোকায়ত বৈশিষ্ট্যও ভাষা, সাহিত্য, শিল্প—সংস্কৃতির মিলিত চেতনাই ছিল প্রধান মানসিক শক্তি ও মনোবল।

দীর্ঘকাল ধরে বাঙালিরা বাংলা নববর্ষ ১ম বৈশাখকে অনেক ঘটনা করে গালন করে এসেছে। পহেলা বৈশাখ এখন বাংলাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। শহরে, গ্রামে সর্বত্র এই উৎসব ও মেলা বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে। পহেলা বৈশাখের উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি দুই-তিন মাস আগে থেকেই চলতে থাকে। তুলিরা তাদের দল গঠন করে, শিশুদের আনন্দের খেলা খুলন্ত চেয়ার ঘুরি, যাত্রাপালা, নাচ, গান অভিনয় মঞ্চে নিজেদের তৈরি করে। অন্যদিকে কুমার তাদের ঢাকায় নানারকম মাটির পাত্র তৈরি করে পুড়িয়ে নেয়, শবের ইড়ি, লক্ষীসরা, কাঠ ও বাঁশের অনেক কারুশিল্প ও খেলনা তৈরি হতে যোগ্য হয়। যেমন— রঙিন হাতি, ঘোড়া, বর—কনে, একতারা, দোতারা, তবলা, ছোট—বড় অশ্বখা দেশ, বাঁশের বাঁশি নানারকম খেলনা ইত্যাদি। গ্রামীণ জীবনকে বিষয় করে চারুশিল্পের আঁকা নানারকম পট (চিত্র) গাঞ্জীরপট খুবই বিখ্যাত চারুশিল্প।

ঢাকা শহরে বাংলা নববর্ষকে প্রথম আহ্বান জানানো হয় রমনার সুবুজ চত্বরের বাঁতলায়। পহেলা বৈশাখে সূর্য ওঠার আগে লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটে এই বটমূলে। শিশু, মহিলা, তরুণ—তরুণীসহ সব বয়সের মানুষ নতুন নতুন গোশাকে সুন্দর সব সঙ্গে অপেক্ষা করে কখন নতুন বছরের সূর্য ওঠবে। শূন্য সংস্কৃতিচর্চার শক্তিশালী ভিত্তি পড়াতো প্রতিষ্ঠান ছায়াট প্রতিবছর আয়োজন করে এই উৎসবের। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াটের শিল্পীরা পেয়ে ওঠে— এনো হে বৈশাখ—এসো এসো...

ছায়াটের শিল্পীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিশায় হাজার হাজার কণ্ঠ—না লক্ষ কণ্ঠ।

একের পর এক গান চলতে থাকে— মানুষের প্রাণের গান, ভাসোবাসার গান, উদ্দীপনার গান, বেঁচে থাকার গান। প্রাণ ভরে উপভোগ করে ছায়াটের এই বিশাল আবেদন— বিদ্যুৎ আয়োজন।

গবেষণা বৈশাখের প্রভাত সূর্যকে আদ্যো আদ্যে কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুশূন্য অনুষ্ঠান ও উপায়ে ব্যয়োজ্ঞান করে থাকে। এরা হলো অবিজ্ঞ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, উপাধী, রবিবার, সুরেরধারা সহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র অনুষ্ঠানের বাংলা নববর্ষে "মঙ্গল শোভাযাত্রা"

চরিত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র অনুষ্ঠানে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বিশাল শোভাযাত্রা (মঙ্গল শোভাযাত্রা)। ছাত্রদের দেশের ভালে ভালে নাচে নচতে আনন্দে উল্লাসে এগুতে থাকে শোভাযাত্রা। চরিত্র ও কাহিনীদ্বারা তৈরি করে সোমস্বামীর দ্বারা বিভিন্ন জগতজিগের সব জগতজিগ। হাতি, ঘোড়া, কুমির, শৈব, সাপ, ময়ূর, মাছ, ফুল, পক্ষিহ অনেক কিছু। বিশাল আকারে তৈরি হয় সোমস্বামীর এই জগতজিগ- যা প্রতিবর্ষে। কিছু আছে কুটিল, গোষ্ঠী, অসংবরণ, রাজ্যকরদের আলা, কিছু আছে-ভালো, সং মানুষের আলা- বারা মানুষের মঙ্গল চায়। চরিত্র ও কাহিনীদ্বারা এই বর্ণাঢ্য বাংলা নববর্ষের শোভাযাত্রা দেশের গতি হাতিয়ে বিশেষের মানুষের কাছেও সমাপ্ত।

বাংলা নববর্ষের উৎসব সারা বাংলাদেশ- গ্রামে-গঞ্জে শহরে আনন্দ উল্লাস নিয়ে পালিত হচ্ছে।

সোমস্বামী ও সর্বজন গ্রন্থ অনুসন্ধান উৎসব হলো- একুশে ফ্রেজারি উদ্‌যাপন। তামাশাবিনোদের প্রতি প্রাণ ও সম্মান জানাবার প্রতীকী বাণী পাঠে প্রভাতকেন্দ্রি, রাস্তার ও শহিদমিনার চত্বরে আদ্যো আদ্যে। প্রতি বছরই চরিত্রদ্বারা আদ্যো আদ্যে, আদ্যো আদ্যে রাস্তার বাণী পাঠে মানুষ হেঁটে আর ফুল হাতে শহিদমিনার দিকে-কর্তৃক থাকে প্রাণ ও ভালোবাসার গান- আমায় ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিতো একুশে ফ্রেজারি, আমি কি ছুটিতে পারি।

২৬শে মার্চ ১৯৭১, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছুঁড়াভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেই দিন থেকেই বাঙালিরা অসু্য হাতে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশকে স্বাধীন করে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। এই দুটো দিনকে বাঙালি জাতি আন্দল টালাসে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের মরণ করে উৎসব করে।

বাংলাদেশের সর্বত্র অনেক নদী। এই নদীকে ঘিরে যে উৎসব হয় তা হলো নৌকাবাইচ। কারুশিল্পীরা সুন্দর ও চমৎকার সব আদলে ও নকশায় কাঠের নাও তৈরি করে। নৌকাবাইচ উৎসবের সঙ্গে রয়েছে-তালের গান, ঢোল, বাঁশ ইত্যাদি।

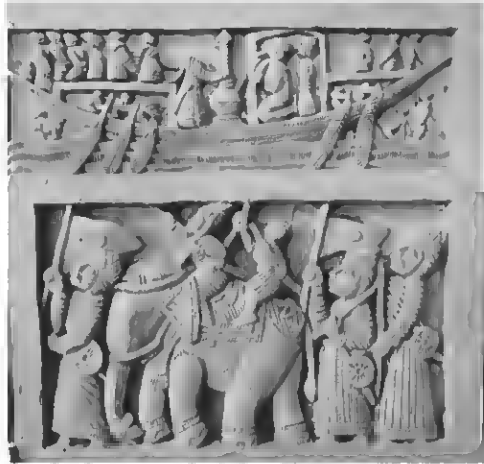
লোকায়ত বাংলার জীবন ও সাংস্কৃতিকে উল্লেখিত উৎসব ও আন্দল অনুষ্ঠানগুলো (পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব, বসন্ত উৎসব, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নৌকাবাইচ) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎসবগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে চাবু ও কারুকলার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে থাকে।

পার্শ্ব : ৭, ৮, ৯ ও ১০

পেশাগত জীবনে চাবু ও কারুকলার প্রয়োগ

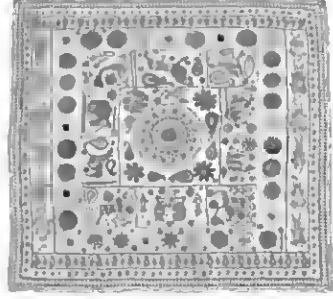
লোকশিল্প বলতে আমরা যে শিল্পকলাকে চিহ্নিত করি তা আমাদের গ্রামগঞ্জে শিল্পীরা একসময় যথাযথ পেশা হিসেবে বিচার করত না। যেমন নকশিকাঁথা গ্রামের মেয়েদের সুখ-দুঃখের কাহিনী বা অন্য কোনো গল্প সে মনের মাধুরী মিশিয়ে রঙিন সুতো ও সূত দিয়ে দিনের পর দিন সময় নিয়ে কাঁথার ফুটিয়ে তুলত। এক-একটি সময় ঠিক করে সে নকশিকাঁথা নিয়ে বসত। এই কাঁথা বিক্রি করা তার পেশা ছিল না। কাঁথা নিজেদের জন্য বা কোনো প্রিয় মানুষের জন্যই সে তৈরি করত।

একইভাবে শরের হাঁড়ি, টেরাকোট, টোপা পুতুল ও পাটের শিকা, হাতপাখা ইত্যাদি নিজেদের আনন্দেই শিল্পীরা করত। ধীরে ধীরে শোকজীবনে এসব শিল্পের কদর বাড়তে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে বাংলার অনেক লোকশিল্প ও কারুশিল্পের সঙ্গে মিশ্রিত রূপ নেয়। নকশিকাঁথার জনপ্রিয়তা এখন দেশে ও বিদেশে সর্বত্র। তাই নকশিকাঁথাকে কেন্দ্র করে কিছু পেশাজীবী শিল্পী তৈরি হয়েছে।



গোড়ামটির ফলকচিত্র বা টেরাকোট

এসের মধ্যে গ্রামের মেয়েরা যেমন আছে তেমনি শহরের মেয়েরাও রয়েছে। এমন কী চারুকলা থেকে পাশ করা শিল্পীরাও নকশিকাঁথা তৈরি করার শিল্পকর্মের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ জীবনে- কামার, কুমার, তাঁতি এরা কারুশিল্পে পেশাজীবী। বাঁশ, কাঠ, খড়, পাতা ও পাট দিয়ে নানারকম খেলনা, শখের জিনিস এমন কী লোকজীবনে ব্যবহারের অনেক কস্তুসামগ্রী তৈরিতে অশিক্ষিত শিল্পী এবং চারুকলার শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। নতুন নতুন ডিজাইনে ও চিত্র বিচিত্র সাজসজ্জায় পোশাকশিল্পকে অনেক আধুনিক আকর্ষণীয় করে তুলেছে চারুকলার শিল্পীরা। যা দেশের গড়ি পেরিয়ে বিদেশেও সুনাম অর্জন করেছে।



নকশিকাঁথা

বাংলাদেশ নামক অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলার চর্চার শুরুর (৫০-৬০এর দশক) চারু ও কারুশিল্পীদের জন্য পেশা হিসেবে তেমন কোনো কাজ লোকজীবনে অনুভূত হতো না। দিনের পর দিন চারুশিল্পীরাও সতৃপ্তি জগৎ-এর মানুষেরা চিত্রকলার প্রয়োজনীয়তা, কারুশিল্পের গুরুত্ব সমাজকে বুঝাতে পেরেছে। একটি উন্নত সমাজে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী এমনি পেশার মানুষ যেমন প্রয়োজন, পাশাপাশি প্রয়োজন স্বপতির, চিত্রশিল্পীর এবং সতৃপ্তির মানুষের। পেশাগতভাবে চারু ও কারুশিল্পীরা বর্তমানে অনেক এগিয়ে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই চারু ও কারুকলা বিষয়টি শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে চারু ও কারুকলার অনেক শিক্ষক। ৪টি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রয়েছে চারুকলা বিষয়ের বিশাল আকারের অনুষদ ও বিভাগ। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রয়েছে চারু ও কারুকলা শিক্ষার বিভাগ। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে চারুকলা চর্চার। নিম্নপর্যায় থেকে শিক্ষার একেবারে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত চারু ও কারুকলায় বহু শিল্পী শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত।

বাংলাদেশের চারু ও কারুশিল্পে সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে অনেক আগে থেকেই। চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবির সমাদর দেশে-বিদেশে ব্যাপ্ত। সমাজে শিক্ষাবোধ ও সতৃপ্তি চৈতন্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে। অনেক ব্যবসায়ী বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। ফলে সতৃপ্তিবানরা অর্পের বিনিময়ে ছবি সজ্জা করছেন। কারুশিল্পও সজ্জা করছেন। তাদের বসবাসের আবাসে চিত্র সাজাচ্ছেন, কারুশিল্প সাজাচ্ছেন স্থাপন করছেন ভাস্কর্য। অফিস প্রতিষ্ঠানের চত্বরে ভাস্কর্যশিল্প প্রতিস্থাপন করে, ঠানের ভবনের দেয়ালে চারু ও কারুশিল্পীদের দিয়ে সৃজনশীল ম্যুরালশিল্প স্থাপন করে প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীরা বিজ্ঞাপনী সর্বস্বার জন্য বুঝি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। টেলিভিশন মাধ্যমে শিল্পীরা অনুষ্ঠানের পটভূমিকে চমৎকার দর্শনিকভায়ে তুলে ধরে প্রতিটি অনুষ্ঠান আনন্দময় ও সুন্দর করে তুলতে পারছে। সংবাদপত্রের জন্য চিত্রশিল্পী অবশ্যই প্রয়োজন। প্রয়োজন চলচ্চিত্রশিল্পে। বাণিজ্যিক ও শিল্প মেলায় শিল্পীরা চমৎকার আকার-আকৃতি ও নকশায় প্যাতিভিয়ন, গোট স্টল তৈরি ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা করে যাচ্ছেন। বাড়ি, অফিস, দোকান, সুপার মার্কেটের অভ্যন্তরীণ নকশা, সাজসজ্জা চারু ও কারুশিল্পীরা নিপুণভাবে সমাধা করছে।

তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় চারু ও কারুশিল্পের প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃতি ও প্রসার ঘটান কারণে পেশা হিসেবে শিল্পীর গুরুত্ব সমাজে তথা দেশে ক্রমে সমৃদ্ধির পথেই এগুচ্ছে। নিসংকোচে তরুণ প্রজন্ম চারু ও কারুকলাকে পেশা হিসেবে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করছে।

পাঠ : ১১, ১২, ১৩ ও ১৪

লোকজীবনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্পকর্ম

লোকজীবনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্পকর্ম সম্পর্কে পূর্বের বিভিন্ন অধ্যয়নে প্রায় সর্বত্র কলা হয়েছে। শিল্পকর্মগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিলে বিবরণটি বুঝতে সহজ হবে।

১. শোকশিল্প : পোড়ামাটির ছোট-বড় পুতুল, পোড়ামাটির ফলকচিত্র, কাঠের তৈরি হাতি, ঘোড়া, মানুষ, পাখি, নকশিকাঁথা, সরাচিত্র, মাটির রঙিন পুতুল, মাটির খেলনা, শীতলপাটি, শব্দের ইড়ি, গমের চিত্র, গাঞ্জীরপট ইত্যাদি।

২. কারুশিল্প : পা, কুড়াল, কোদাল, পোড়ামাটির ইড়ি, পাতিল, শানকি, বাটি, মাটির তৈরি ব্যাকে, মটকা ইত্যাদি। বাঁশের তৈরি টুকরি, ঝাঁচা, ঝাঁকা, ছোট বড় বাঁশ, ইঁকো, মাছ ধরার চাই, মাখাল, ঘরবাড়ির জন্য নানারকম নকশা ইত্যাদি। ঝাঁপার থালা, ঘটি, পিতলের কলসি ইত্যাদি। সোনা, রূপার অলঙ্কার, তামার পাত্র। বাংলাদেশের কাঠের কারুশিল্প বেশ সমৃদ্ধ। ঘরের দরজা-জানাশার কপাট, খাট, পাখ ও আলমারির গায়ে ফুল-পাখির ছবি, লতাপাতা এমনকি লোকজীবনের দৃশ্য নিখুঁতভাবে কাঠ খোদাই করে রিলিফ শিল্পকর্মগুলো উন্নতমানের কারুশিল্প। বাংলাদেশের নদীতে ও সমুদ্রে চলাচলের ছোটবড় নানা অবয়বের নৌকা বাংলার কারুশিল্পীরা করে থাকেন।

বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র, সোফা, চেয়ার, টেবিল, মোড়ানো উন্নতমানের কারুশিল্প।

বাঁশ, কাঠ, লোহা, টিনের পাত ও প্রাস্টিকের সমন্বয়ে তৈরি হয় যানবাহন রিকশা। রিকশার কারুকাজ সৌন্দর্যসূচি ও নন্দনিক রূপের জন্য দেশে বিদেশে নন্দিত। জাপান, বৃটেন, আমেরিকা ও কানাডার রিকশার কারুকাজের প্রশংসা হয়েছে। রিকশার শেহনে শিল্পীরা যে ছবি আঁকেন সেই চিত্রকলাও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা অর্জন করেছে।

লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আধুনিক চিত্রকলা, নকশা, পোশাকশিল্প, সিরামিক শিল্প, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ভাস্কর্য, ম্যুরাল এবং স্থাপনা শিল্প।



বিভিন্ন রকমের কারুশিল্প

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের অনেক প্রদর্শনী হচ্ছে। ডান্সকর্ষের ও আধুনিক কারুকলার প্রদর্শনী হচ্ছে। সন্তোষভিবান রুটিশীল মানুষ ও শিল্পের সমর্থদার মানুহের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাঁরা শিল্পকলা-তথা চিত্রকলা, ডান্সকর্ষ ও অন্যান্য শিল্পকলা অর্ধের বিনিময়েই সঞ্চার করছেন। নিজেদের বাড়ি, ঘর, অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাজাচ্ছেন। শিল্পকলা তাঁদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পশুর চামড়া দিয়েও নানারকম কারুশিল্পের কাজ হচ্ছে। চামড়ার ব্যাগ, জুতা ও পোশাকের দেশে যেমন কদর বিদেশেও তেমনি।

নমুনা প্রশ্ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে লোকশিল্প হলো—

ক. নকশাকীর্ষা, শখের ইঁড়ি

খ. ভামা-কঁসার তৈজসপত্র

গ. বাঁশ ও বেতের বুড়ি

ঘ. উপরের সবগুলো

২। বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব কোনটি?

ক. বড়দিন

খ. বুদ্ধপূর্ণিমা

গ. দুর্গাপূজা

ঘ. ঈদ

৩। টোপা পুতুল কিসের তৈরি?

ক. মাটির

খ. প্লাস্টিকের

গ. লোহার

ঘ. কাঠের

৪। জুম চাষ কোথায় করা হয়?

ক. নদীর তীরে

খ. সমতল ভূমিতে

গ. পাহাড়ের ঢালে

ঘ. সমুদ্রের তীরে

৫। মজল শোভাযাত্রা আয়োজন করে—

ক. চারুকলা অনুষ্ঠান

খ. বাঙালি একাডেমি

গ. শিল্পকলা একাডেমি

ঘ. শিশু একাডেমি

শিখে জবাব দাও

১. বাঙালি লোকজীৱনে চাৰু ও কাৰুকলা— শহৰে বিষয়টি কীভাবে দেখা হয়— বৰ্ণনা দাও।
২. গ্রামীণজীৱনে চাৰু ও কাৰুকলাৰ প্ৰয়োজন সম্পৰ্কে একটি সৰ্বক্ষিপ্ত বিৱৰণ দাও।
৩. লোকায়ত বাতাল চাৰু ও কাৰুকলাৰ অবস্থান ও ব্যবহাৰ নিয়ে সৰ্বক্ষেপে লেখ।
৪. বাংলাদেশে ১লা বৈশাখ—বাংলা নববৰ্ষ উদযাপনেৰে একটি সৰ্বক্ষিপ্ত বৰ্ণনা দাও।
৫. বাৰো থেকে পনেরটি বাক্যে জবাব লেখ।

ক. গ্রামেৰ বৈশাখী মেলা।

খ. ছায়ানটেৰ ১লা বৈশাখ উদযাপন।

গ. চাৰুকলা অনুসঙ্গে মজাৰ শোভাযাত্ৰা ও মেলা।

ঘ. চাৰুকলাৰ শিখীয়া কোন কোন পেশায় কাজ কৰে চলেছে।

ঙ. লোকশিখী ও লোকশিল্প।

চ. বাঁশ, বেত ও কাঠেৰ কাৰুশিল্প।

ছ. সমাজে একজন চিত্ৰশিল্পীৰ গুৰুত্ব।

৬. সৰ্বক্ষিপ্ত টিকা লেখ

কামাৰ, কুমাৰ, নকশিকাঁথা, নৌকাবাইচ, আলপনা, এক্সে ভেক্সুয়াৰি, ৱিক্কা, কাঠে খোদাই কৰা শিল্পকৰ্ম, পটেৰ শিল্প, হাতপাৰা।

চতুর্থ অধ্যায় জীকতে হলে জানতে হবে



শিল্পীর অনুভূত অবস্থাকে জীক তুলিয়েছে।

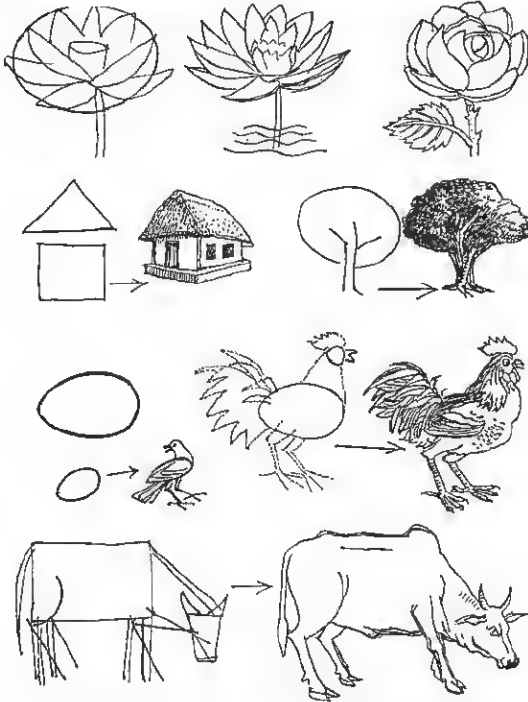
এ অধ্যায় পড়া শেষ করার পর—

- যদি জীকর শিরসখুলে ব্যাথা করতে পারবে।
- যদি জীকর বিভিন্ন উপকরণের বর্ণনা দিতে পারবে।
- যদি জীকর বিভিন্ন মাণ্ডল ও তার ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ : ১

ছবি আঁকার নিয়ম

যদি শ্রেণিতে আমরা ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো সম্পর্কে জেনেছি। আমরা জেনেছি যে, ছবি আঁকতে হলে বস্তু বা বিষয়ের আকৃতি, পড়ন, অনুশীলন ইত্যাদি খেয়াল করে প্রথমে ড্রইং করে নিতে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকেই তিনটি আকৃতিতে বোঝা যায়। সেগুলো হচ্ছে বৃত্ত, মিস্ত্রী এবং চতুর্ভুজ। কোনটি কোন আকৃতিতে পড়বে তা ভালোভাবে বুঝে নিয়ে আকৃতি ঠিক করতে হয়। এ অধ্যায়ে আমরা ড্রইং করার পদ্ধতি—আকার—আকৃতি, অনুশীলন ও পরিশ্রমিক এর ভূমিকা সম্পর্কে জানব। সেই সাথে ছবিতে কম্পোজিশন ও আলোছায়ার পুঙ্খ ও এর সঠিক প্রয়োগ বিষয়ে জানব।



আকার—আকৃতি, কল্পের রূপ ও আলো কম্পোজিশন, আলোকোণ বা ভিসিওয়ালা
তালো করে দেখে তারপর আঁকতে হয়।

ছইন

কোনো কলহ বা কিয়ের ছবিতে শুষু রেখা দিয়ে কাঁপজল বা কানভাসে বাঁককে ছইন বলে। এই ছইন পেনসিলে, কলমে, কঠর কলনার বা তুলি দিয়ে করা হয়। বস্তুভাবে কোনো কলহর, জীবজন্তুর ও পাখাশার পরে কোনো রেখা সেই। যে রেখা আমরা বাঁকি-ছইন করায় অন্য তা হলো- মনে কর একটি কলসি। কলসিটি গোল-এর একটা আকর ও আয়তন আছে। কলসি বেশ খানিকটা জারখা দখল করে অবস্থান করে। আমরা এই কলসিকে কাঁপজলের সমতলস্থিতিতে কয়েকটি রেখা দিয়ে ছুটিয়ে তুলি। এই রেখা হলো আমাদের সৃষ্টির সীমারেখা। কলসিটি সামনের দিকে অনেকখানি পেছার পর আর আমরা দেখি না। সৃষ্টি যেখানে ছাটকে বার সেখানেই রেখাকে অনুমাল করে সেই। এতরবে পাখর, নদীনালা, গুহাশা, জীকজু, দালানকোঠা সবকিছুই আমরা এমনভাবে সেখতে অত্যন্ত বা আমাদের চোখ এতাবেই সেখতে ব্যব্য করে। সৃষ্টি যেখানে ছাটকে বার সেখানে কালনিক রেখা দিয়ে কাঁপজলের সমতলস্থিতিতে সবকিছুই ছুটিয়ে তুলি। এই ছবিতে বারত নিখুঁত ও সুন্দরভাবে ছুটিয়ে তোলা হয় পাখাশারাকে ঠিকভাবে এনে।

২. আলোছায়া বা শুষু রেখা দিয়ে কাঁপজলের সমতল স্থিতিতে ছবি আঁকা হলো বিশেষাণের তখন, আয়তন ও আকর কুরতে কট হয় না। অর্থাৎ কলসি যে গোল, এর তখন আছে এক খানিকটা অয়গা দখল করে থাকে, এমন সমতল কাঁপজ রেখা দিয়ে আঁকা হলো কুরতে কট হয় না। তাই নিখুঁত ছবি ছুটিয়ে তোলায় অন্য ছবি আঁকার কয়েকটি অপরিস্থিতির বিষয় ও নিয়ম সম্পর্কে সক্রতন হতে হয়। সেগুলো হলো-

- ১। আকর ও আকৃতি
- ২। অনুপাত
- ৩। পরিবেশিক
- ৪। কল্যাণশিন
- ৫। আলোছায়া
- ৬। ২২

১। আকর ও আকৃতি : আমাদের চারপাশে বেশখ জিনিস রয়েছে- পাখাশা, জীবজন্তু সবকিছুই নিজস্ব আকর ও আকৃতি রয়েছে। কোনোটা গোলকর, কোনোটা সম্বাটে, কোনোটা চারকোণা বা তিনকোণা ইত্যাদি। একই ভালো করে লক্ষ করে সেখবে প্রায় সব জিনিসই উপরে উল্লিখিত আকৃতির মধ্যে পড়ে। যেমন- কল, কল, গাছ এলব পোশাকর। ঘর, বাড়ি, বোকা ইত্যাদি চমুহুঁক ও ত্রিভুজের আকরে বেশা বার। পাখি প্রায় সবই তিন্য়াকৃতি (খোলাকায়ের ত্রিভুহুঁক)।

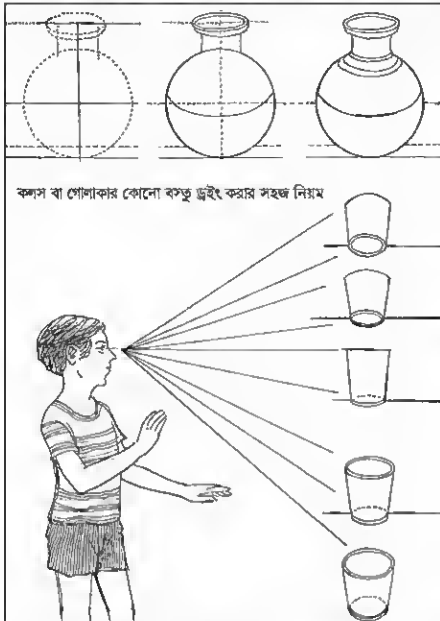


ছবিতে 'অনুপাত' ঠিকভাবে ছুটিয়ে কুরতে যা পারলে ওপরের ছবির মতো অবস্থা হয়

২। **অনুপাত** : ছবি আঁকার বিষয়ে ‘অনুপাত’ একটি অতি জরুরি বিষয়। অনুপাত ছাড়া ছবি নিখুঁত হয় না। যেমন- একটি কলস শরীরের তুলনায় কলসের মুখ ও ঘাড়ের একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে। শরীরের তুলনায় মুখ ও ঘাড় কতটুকু ছোট-বড় হবে তা ভালোভাবে দেখে ঠিক করে নিতে হবে। একজন মানুষের শরীরের তুলনায় তার হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি কী মাপের হবে তা সুনির্দিষ্ট করে আঁকতে হবে। আবার একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিতে- অনেক গাছপালা, জীবজন্তু ও জিনিসপত্র থাকে। তাদের প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব বিশেষ আকৃতি ও মাপ রয়েছে। তুলনামূলকভাবে কোনটি বড় হবে, কোনটি ছোট হবে তা ভালোভাবে লক্ষ করে ছবিতে সাজাতে হবে।

পাঠ : ২ ও ৩

৩। **পরিপ্রেক্ষিত** : বাস্তবধর্মী ছবি আঁকার জন্য পরিপ্রেক্ষিত প্রয়োজন। পরিপ্রেক্ষিত ঠিকমতো ছবিতে উপস্থাপন করতে না পারলে বা ফুটিয়ে তুলতে না পারলে সে ছবি সত্যিকারের বাস্তব ছবি হয়ে ওঠে না। আমাদের চোখ, সে চোখে দেখা, দেখার নানারকম ভঙ্গি, এ সবের উপরই পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর করে। যেমন- একটি কাচের গ্লাস মেঝেতে রেখে ভূমি তা



কলস বা গোলাকার কোনো বস্তু ড্রইং করার সহজ নিয়ম

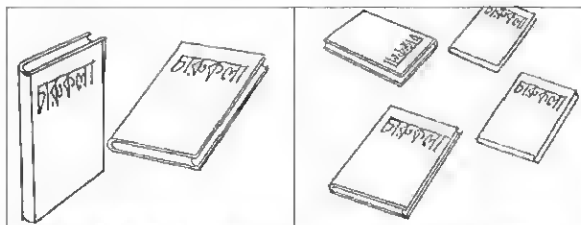
দেখাছ। ভূমি একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে কাচের গ্লাসটি ধীরে ধীরে কয়েকটি পর্যায়ে উপরের দিকে তুলে ভালো করে দেখ। যখন যেমন- দেখছ, প্রত্যেকটি পর্যায়ের অবস্থানের হুবহু ছবি আঁক। এক পর্যায়ে গ্লাসের উপরিভাগে তোমার চোখের সমান্তরালে অবস্থান করে ছবি আঁক। এবার গ্লাসের সবগুলো অবস্থানের ছবি মিলিয়ে দেখ। তোমার দেখার ভঙ্গির জন্য একই গ্লাসের কত রকম রূপ হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে তোমার পড়ার টেবিলে একটি বই রেখে ভালোভাবে দেখ- বইয়ের অবস্থান কীভাবে রয়েছে। এবার দেখে দেখে বইটির ছবি আঁক। একই বইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন অবস্থানে রেখে আঁক। এবার সবগুলো ছবি মিলিয়ে দেখ একই বইয়ের কত রকম রূপ হয়।

আগের বইটির সমান আকারে আরও দুটো বই সামনে-পেছনে করে সাজিয়ে একই নির্দিষ্ট স্থান থেকে ভালোভাবে

পরিপ্রেক্ষিত বা পারসপেকটিভ।

চোখের সমান্তরালে আমরা কোনো বস্তু যেভাবে দেখি।



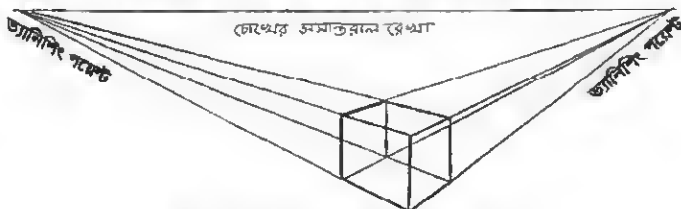
একই বই তিন তিন অবস্থানে তিন চোখের।

একই বাপের বই দুই বা ও অবস্থানের
কারণে যেট বড় হয়ে যাচ্ছে।

শব্দ কর। সামনের বই বড় বড় মনে হবে, পত্রেরটি মনে হবে আরও ছোট আরও দূরে যে বই সেটি মনে হবে আরও ছোট। অর্থাৎ বড়ই দূরে বাচ্ছে ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। এই একই বাপের বই অর্থাৎ এটা কেন হচ্ছে? কারণ আমরা এভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। চোখ আমাদেরকে এভাবেই দেখতে বাধ্য করে।

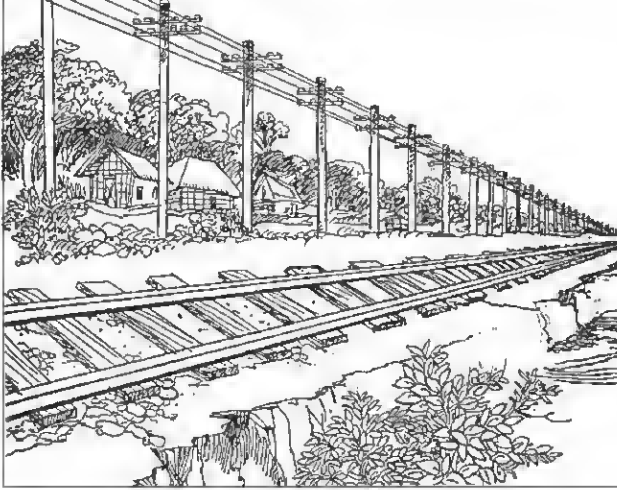
ভোমর শব্দের জানালা দিয়ে বাইরে তাকও। খেদার ঘাট, বাজার, পাছপালা, রাস্তা, মানুষ—এমনি অনেক কিছুই একসঙ্গে চোখে পড়বে। অর্থাৎ জানালায় মাপ কত? কড়ালোড় চারকুট সম্মা ও তিনকুট চওড়া।

কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে লক্ষ করে দেখ। কর্তের ত্রিভুজের উপর দিয়ে লোহার দুটো শাইন দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছে। শাইন দুটো পাশাপাশি লম্বা দূরত্বে রেখে কালো হয়েছে। কেন্দ্রবিন্দু এক ইঞ্চি এলিক—সেলিক হওয়ার উপর নেই। আর সামান্যতম ব্যতিক্রম হলে ট্রেন চলাবেই না। এমনি এক কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে ছবি সামনের দিকে তাকও।



সব দিকে সমান এই চরকোনা যার ঠিক পরিপ্রেক্ষিত দুখানো হয়েছে

কেন্দ্রবিন্দু লোভা পথে যেখানে অনেক দূর চলে গিয়েছে সেখানকার জায়গা দেখে ঠিকানা। যেখানে কেন্দ্রবিন্দু ঠিক হয়েছে—সেখানে নয়। সেখানে পশুপাশি লোহার লাইন দুটো ঠিক ঠিক এক বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়েছে। কেন্দ্রবিন্দুর পাশে যে ট্রেনের কালের থামগুলো পত্রের রয়েছে সেগুলোও একই সমান্তরাল রেখার একই বিন্দুতে এসে মিলে যাবে। মাথার উপরে তাকও ও ঘাট-ঘাট, পাছপালা সবই দেখবে তোমার চোখের সমান্তরাল রেখার বাপের সেই বিন্দুতে এসে মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ভোমর দেখার সীমালী এই বিন্দুতে শেষ হয়েছে—যে বিন্দু ভোমর চোখের সমান্তরাল রেখার। এই বিন্দুকে ইংরেজিতে বলে 'ভ্যানিশিং পয়েন্ট'। চোখের সমান্তরাল রেখাকে বলে 'কেন্দ্রবিন্দু লাইন'। বাজার কালি বার 'দিশ রেখা'। দিশ রেখা খোলা মাঠে বা বড় নদী ও সাগর জীরে ঠিকানা আরও পরিষ্কার দুখানো।



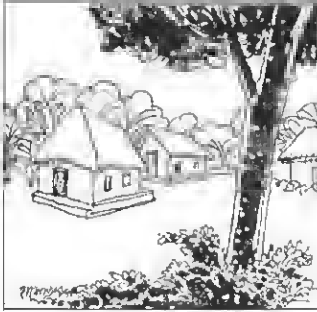
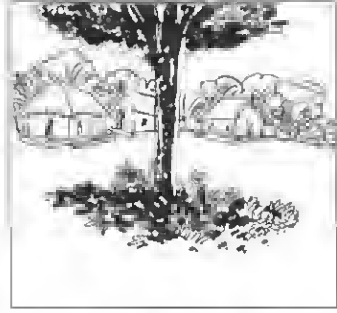
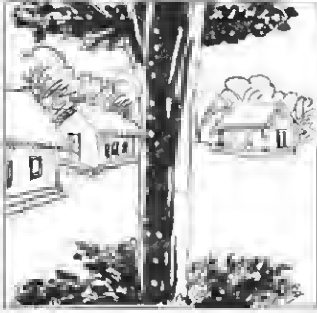
রেল লাইনের কাছে পড়িয়ে দেবে পরিচেন্ত কিশোরী তাশোদে বুঝা যায়।

পরিচেন্ত মুখ আকারে আকৃতির ছোট-বড়, সামনে-পিছনে ও দুইদিক সুকাবার জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনি রং ও আলোছায়ায় কেন্দ্রে আবদ্ধ। ছবিতে সামনের দিকে রং বড় উজ্জ্বল ও প্রাণের হবে; বড়ই দূরে যাবে রং ধীরে ধীরে হ্রাস হয়ে যাবে। যেমন, লাইনের পাশে পাতা বড় সবুজ হবে, ঘ্রোম ও আলোছায়ার প্রকাশ বর্তমানি প্রকাশ হবে, একপাশে গল দূরে একই বসনের পাশ আকারে যেমন ছোট হয়ে যাবে তেমনি সবুজ রং অনেক হলতা ও শীতের আভা মেলাতো হবে। আলোছায়া ও ঘ্রোমের প্রাণেরতাও অনেক কমে আসবে। রং কতটুকু হ্রাস হবে বা হলতা হবে তা সঠিকভাবে ছবিতে ছবিতে তেমনই হলো পরিচেন্ত। ছবিতে পরিচেন্ত ঠিক হলোই দুই পাশের সুবৃৎ যে একপাশ গল তা সহজেই স্কট উঠবে। পরিচেন্ত ঠিকমতো প্রকাশ করতে না পারলে ছবি প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

পাঁঠ : ৪

কল্যাণজিগণ

কল্যাণজিগণ ইয়েজিগণ। বালা লর্ড-কল্যা। মনে কর পুত্র শিরে রচনা সেবা হবে। পুত্র সন্তানকম পরিচর যাতে সঠিকভাবে প্রকাশ পায়, সেভাবে ভাষা দিয়ে ছবি রচনা তৈরি করবে। ছবির কেন্দ্রে 'রচনা' বা কল্যাণজিগণ মনেকটাই তই। মনে কর, এই পুত্র ছবি আঁকতে শিরে কল্যাণজিগণ - তোমার কাগজের আকার অনুযায়ী পুত্র বড় করবে-পুত্রকে কাগজের ঠিক মাঝখানে রাখবে না ভাল পাশে বা বাম পাশে উপরের দিকে বা নিচের দিকে অর্থাৎ বড় বড়



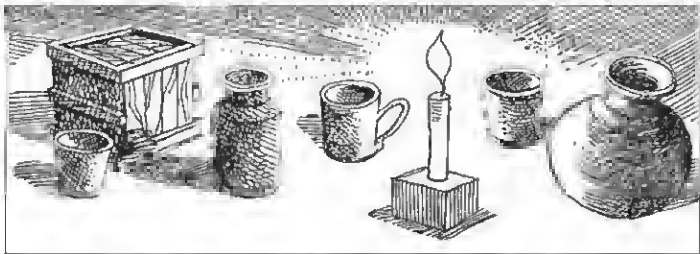
কল্যাণবিশ্ব, একই বিশ্ববস্তুর—ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তন্ন তন্নরূপে
সমালোচনা হয়েছে। যেটি ভালো ও সুন্দর সেটিই বাঁকতে হবে।

করে বাঁকলে ও কণাভের কতটুকু জায়গা দিয়ে গল্প ছবিটা সামালে ছবি দেখতে সুন্দর হবে— তা ঠিকমতো কবাই হলো
হক্কি কল্যাণবিশ্ব। ছবির কল্যাণবিশ্ব ঠিক করার সময় হক্কি বিশ্বের বেশব বাঁধ, জীবজন্তু বা অন্যান্য জিনিস থাকে
তন্ন আকার—স্বাক্ষর, রং, আলোভাওয়া এসব মনে রেখে বিষয়টি হাতে সুন্দরভাবে ছুটিয়ে তৈরি করে সেই ভাবে সামালে
হবে এবং ভালোভাবে চিত্রায়না করে ঠিক করে নিতে হবে। তাই, যে বিষয়ে ছবি আঁকা হবে তন্ন জন্য অল্পত
ভিন্ন রকম বা চিত্র রকম কল্যাণবিশ্ব ছোট কাগজে একে সর্বশেষে পাশাপাশি রেখে ঠিক করতে হয় কোনটি বাঁকলে বেশি
সুন্দর হবে। সবদিক বিবেচনা করে যে কল্যাণবিশ্বটি ভালো হবে কল মনে হয় সেটিই বড় করে মুদ্রা ছবি আঁকতে
হবে।

পৃষ্ঠ : ৫

আলোছায়া

হৃদি আঁক্স আলোছায়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। হৃদিকে আলোছায়াকে সঠিকভাবে স্থাপন করে না শরমে অবস্থান করে পড়ে। বাক্যগির হয় না। আমরা যদি সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সূর্য্যোদয় প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রদান সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সূর্যের অবস্থান আলোকে কোন কারণে। যে দৃশ্য আঁকা হবে তাকে যেন কেমনভাবে পড়ে। দৃশ্য পাছালা, জীবন্ত ও অন্যান্য জিনিসের উপর আলোর অবস্থান এক ভঙ্গির দ্বারা যাচিকে কীভাবে পড়েছে তা ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে। যন্ত্রের ভেতরে ও ছায়ায় যেসব বিষয়ের হৃদি প্রাপ্ত আলোছায়া থাকে। কোনো স্থির জীবন, মানুষ বা জলানিহ্ন স্থান, এ ধরনের বিষয় যন্ত্রে আলো আঁকা হয়। সরল-অন্যথা বা অন্য কোনোভাবে আলো এসে এসে উপর পড়ে। আলো কীভাবে এসে পড়েছে—তারপর ধীরে ধীরে আলো থেকে গাঢ় হয়ে ছায়া পড়ে।



হৃদিকে 'আলোছায়া' কবিতাভাবে আঁকতে হবে। তারপর হৃদিকে যেন ও ছায়া কীভাবে পড়েছে তা দেখানো হয়েছে। দিগন্ত হৃদিকে—সেইসবটির কারণে প্রতিফলন ও বিভিন্ন 'ছায়া' স্থাপন।

আশোছারর যে ভরতম্য ঘটে তা বিশদভাবে খেলার রেখে ঐক্যে হয়। যুক্তি আশোছারকে যেটামুটি ভিনতালে তাল করা যায়।

- ১। খুব বেশি আসো
- ২। মাঝামাঝি আসো ও ছয়া
- ৩। হলক ছয়া ও গাঢ় ছয়া

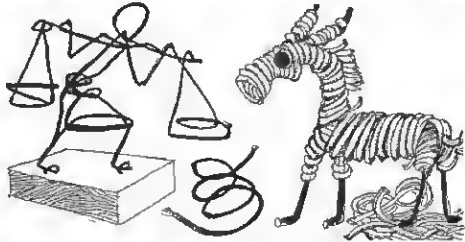
রক্তের জন্য আশোছারতত্ত্ব ভরতম্য ঘটে। একই ছবিতে পাশাপাশি যদি শাল, নীল, লাল ও কালো রক্তের কিছু ভিনিস থাকে এক তালে যে আসো ও ছয়া পড়ে তা বিভিন্ন রং হওয়ার ভরতম্য ঘটে বা শাসনকম আশোছয়া হয়। প্রতিটি রক্তের আশোছারর এ ভরতম্য ভাষ্যভাবে শক করে সঠিকভাবে ঐক্যে হয়। পূর্বের পৃষ্ঠার আশোছারর কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে। ভাষ্য করে শক করলে বিষয়টি সুকৃতে সহজ হবে।

রং : ছবির প্রাণ বলতে বুঝায় রং। যে বিষয়ে ছবি ঐক্য হবে তার রং খুব ভাষ্যভাবে শক করে ভরতম্য ঐক্যে হয়। শাল রং হলে শাল লাগিয়ে দিলেই হয় না। আশোছারর জন্য এবং আশপাশের অন্যান্য রক্তের আকার নানান প্রতিফলনে রক্তের অনেক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন ও ভরতম্য ভাষ্যভাবে বুঝে গিয়ে শাল রং লাগাতে হবে। লালনা কখনো কখনো বসি আশোছার প্রকৃতি বা বাহ্যপাশা সত্য, উজ্জ্বল সত্য, হলুদ আভাসিত সত্য, শাল, নীল মেখালো সত্য, সত্যের মাঝে আছে আলো ও শাল রকম রং। সুতরাং গাছ ঐক্যে সত্য শালাসেই ঠিক রং করা হলো না। যে ধরনের সত্য সেই সত্যই লাগাতে হবে। তা না হলে ছবি প্রাণহীন মনে হবে। রক্তের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ছবি ঐক্যের জন্য কোন কোন রং ব্যবহার করা যায় তার পরিচিতি আশেই নেওয়া হয়েছে। যে রং গিয়ে ছবি ঐক্য হবে সে রক্তের ব্যবহার-নিয়ম কয়েকদিন অভ্যাস করে রঙ করে গিতে হয়। রক্তের ব্যবহার বন্ধাব না হলে ছবি নষ্ট হওয়ার অনেক সম্ভাবনা থাকে।

পাঠ : ৬

কাঁপড়, কাঁপড়ের ছবি এবং কাঁঠ ও কেলনা ভিনিসের ভাস্কর্য

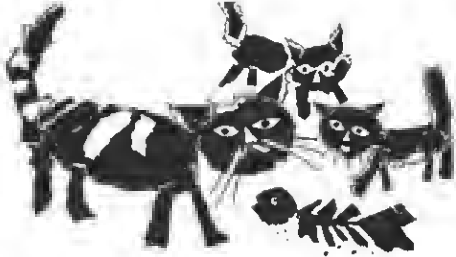
রং-হুগি গিয়ে ছবি না ঐক্যে ছবি তৈরি করা যায়। যারা রং ও হুগি বোঝতে করতে পারছে না-সুখ করার কিছু নেই। এক রঙা কাল-হুগি, শাল, শাল, সত্য প্রকৃতি রক্তের কাঁপড় বাহারে কিনতে পাওয়া যায়। সেগি-হিসেগি পুরানো পত্রপত্রিকা সত্য করে নাও। এই রক্তের কাঁপড় ও পত্রপত্রিকা কাঁপড় কেটে-হিঁড়ে অন্য একটি কাঁপড়ে আঠা গিয়ে লাগিয়ে যায় যায় ইচ্ছেমতো ছবি সত্যই তৈরি করা যায়। যে কাঁপড়ে ছবি তৈরি করবে- সে কাঁপড়টি একটু মোটা হলে ভালো হয়। এভাবে ছবি তৈরি করার জন্য একটা স্টেট কাঁটি, ক্রেড, আঠা ও কিছু



শোখের তার ও পড় পৈঠিয়ে ভাস্কর্য

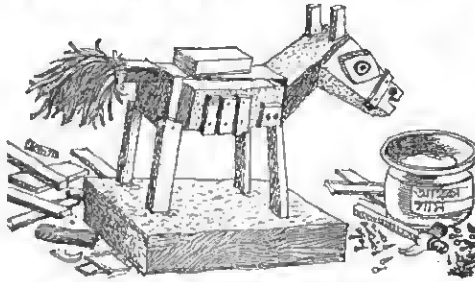
রঙিন কাগজ প্রয়োজন। তা হলেই যে কেউ ছবি তৈরি করতে পারবে। একইভাবে রঙিন টুকরো কাগজ দিয়েও ছবি তৈরি করা সম্ভব। টুকরো কাগজ বেলাড় করা মোটেই কঠিন নয়। দর্জির মোকাসে গেলা গ্রহুর কাগজ সজ্জা করতে পারবে।

কেননা জিনিস- কাগজ, কাঠ, কাগজ, চীনাঘাটির ইট্টিপাতিদের তাম্বা টুকরা ইত্যাদি দিয়ে অনেক রকমের ছবি ও ভাস্কর্য করা যায়।



কোনো ছবি। কাগজ ছিঁড়ে ও কেটে ছবি।
এভাবে রং-বেরঙের কাগজ ছিঁড়ে ও কেটে কোনো ছবি করা যায়।

কাগজ কেটে ছবি করা বা টুকরো কাগজ দিয়েই ছবি বানাও-যে ছবি বানাবে তা পেনসিলে হালকা রেখা দিয়ে মোটা কাগজটিকে চুইং করে নিলে ছবি তৈরি করতে সুবিধা হয়। কাটা কাগজ ও কাগজ পিটো ছবিতে প্রয়োজনমতো রং দিয়ে একেও ছবি করতে পার। অনেক বড় বড় শিল্পী কাগজ, কাগজ পিটে ও কিছু হাঁকে এরকম ছবি তৈরি করেছেন। এ ফরাসের ছবিকে কলা হয় 'কোলাজ' ছবি।



টুকরা কাঠ খোঁড়া গাণিয়ে নানা রকম ছোটখাটো ভাস্কর্য তৈরি করা যায়।

কাঠের টুকরা : ছোট বড় নানা আকৃতির কাঠের টুকরা পাওয়া যেতে পারে। কাঠখিঁড়িরা যেখানে কাথ করে সেখানেই অনেক টুকরা কাঠ মিলে বাবে। এসব কাঠের টুকরা একটির সাথে আরেকটি জোড়া গাণিয়ে-নানা রকমভাবে সাজিয়ে দেখে ছোট ভাস্কর্য তৈরি হয়ে বাবে। কখনো কখনো হাতি, ঘোড়া বা মানুষের আকৃতি সেরা যায় এভাবে। ছবির উল্লম্বরূপেও দেখ।

পাতের তাল : একটু ভালোভাবে লক করলে নানা আকৃতির সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। সেগুলোকে একটু কেটে ছোট্টে নিলেই ছোট ভাস্কর্য তৈরি হয়ে পেল। এভাবে ছোটকল্প দুটি পাতের খুঁজে এক-দুটো একে এক-দু-চারটি জোড়া গাণিয়ে ভাস্কর্য করা যায়। সেখান থেকে কাগজ পিটোয় এবং একটু মোটা তাল হাত দিয়ে ঝিকিয়ে অনেক রকম ভাস্কর্য করা যায়।

পৃষ্ঠ : ৭

ছবি আঁকার উপকরণ

সাধারণভাবে আঁকার উপকরণ-পেনসিল, কলি, কলম, লালক, পেনসিল রং, প্যাস্টেল, ময়দাশিল, কাঁচকালা, ক্রয়ন, মার্শি কলম, বিভিন্ন ফ্রিশ, ডেলফ, কাগজ ও ক্যানভাস। এ ছাড়াও ইয়েল, টেক্স, হার্ডবোর্ড, ক্রিশ, ফ্রিশ, কাঁচ, ক্রেড,

আঠা, তিসির তেল, তারপিন তেল এমনি আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় ছবি আঁকার জন্য। সব উপকরণই একসাথে যোগাড় করার প্রয়োজন হয় না। যে মাধ্যমে ছবি আঁকা হবে সেই মাধ্যমেই উপকরণগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে। এখানে কয়েকটি মাধ্যমের বর্ণনা ও উপকরণের বিবরণ দেওয়া হলো।

কাগজ

এক সময় আমাদের দেশে ঢাকা শহর ও তার আশপাশে ছবি আঁকার উপযোগী কাগজ হাতে তৈরি হতো। হাতে তৈরি কাগজকে ইংরেজিতে বলে 'হ্যান্ডমেড' পেপার। প্রায় ২৫/৩০ বছর ধরে এ কাগজ আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে না। তবে আমাদের আশপাশের অনেক দেশেই হ্যান্ডমেড কাগজ তৈরি হচ্ছে। যেমন-ভারত, নেপাল ও মিয়ানমারে। হ্যান্ডমেড কাগজ জলরঙে ছবি আঁকার জন্য সবচেয়ে উপযোগী কাগজ। বাংলাদেশে ছবি আঁকার জন্য যে কাগজ সহজলভ্য তা হলো কার্ট্রিজ কাগজ। কার্ট্রিজ পাতলা ও মোটা দুই-তিন রকম হয়ে থাকে। বেশি মোটা ও খসখসে কার্ট্রিজে জলরঙে ছবি আঁকা যায়। বেশি মসৃণ কাগজে জলরং ছবি ভালো হয় না। ছবি আঁকার জন্য বিদেশের তৈরি অনেক রকম কাগজই পাওয়া যায়।

ছবি আঁকার বোর্ড, ক্রিপ ও ইঙ্গেল

ছবি আঁকার কাগজ রাখার জন্য প্রাইউভের তৈরি বা হার্ডবোর্ডের তৈরি একটি বা দুটি বোর্ড প্রয়োজন। আমাদের দেশে হার্ডবোর্ড তৈরি হয় তাই এটি সহজলভ্য। প্রয়োজনমতো মাশের একটি হার্ডবোর্ডের টুকরা করতে দিয়ে কেটে ভার কিনারা শিরীষ কাগজে ঘষে মসৃণ করে নিলে ছবি আঁকার বোর্ড তৈরি হয়ে গেল। সাধারণত বোর্ড ৪৫x৬০ সেমি. মাশের হলেই ভালো হয়। সম্ভব হলে বড় ছবি আঁকার জন্য আরও বড় বোর্ড তৈরি করে রাখতে পার। জলরং, পোস্টার রং, পেনসিল, কালি-কলম, ক্রেনন, প্যাস্টেল এসব মাধ্যমে ছবি আঁকা হয় কাগজে এবং এই কাগজ বোর্ড ক্রিপ দিয়ে ভালোভাবে আটকিয়ে নিতে হয়। আটকানোর জন্য দুটো থেকে চারটি ক্রিপ অবশ্যই প্রয়োজন।

ইঙ্গেল

ইঙ্গেল হলো ছবি আঁকার স্ট্যান্ড। ছবি আঁকার বোর্ড ইঙ্গেলে রেখে ছবি আঁকতে হয়। জলরং, কালি-কলম, পেনসিল এসব মাধ্যমে ছবি আঁকতে অনেক সময় টেবিলে রেখে, হাতে রেখে বা মেঝেতে রেখে ছবি আঁকা যায়। ইঙ্গেলের খুব প্রয়োজন হয় না। কিছু তেলরঙে আঁকতে গেলে ইঙ্গেল অবশ্যই প্রয়োজন। ইঙ্গেল কাঠ এবং অ্যালুমিনিয়ামের হয়ে থাকে।

পাঠ : ৮, ৯, ১০

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম

বিভিন্ন মাধ্যমেই আমরা ছবি আঁকতে পারি। যেমন-পেনসিল, প্যাস্টেল, কালি-কলম, জলরং, তেলরং, পোস্টার রং ইত্যাদি।

সাদা-কালো ছবি

পেনসিল : কাঠ পেনসিলের গায়ে লেখা থাকে- HB, 1B বা B, 2B, 3B, 4B, 6B। HB হলো মোটামুটি শক্ত শীষ পেনসিল। সাদা কাগজে হালকা ও শক্ত দাগ হয়। 2B-1B এর চেয়ে নরম ও দাগ কাটলে বেশি কালো হয়। এভাবে 3B আরও নরম এবং কালো। 4B-3B এর চেয়ে নরম ও কালো এবং 6B সবচেয়ে নরম ও কাগজে সবচেয়ে কালো গভীর দাগ কাটে। শুধু এই পেনসিলগুলো দিয়েই সাদা কাগজে সুন্দর সাদা-কালো ছবি হতে পারে। পেনসিলকে নানাদিক থেকে ঘষে বা ছোট রেখা ও লাইন টেনে আলোছায়ার অনেক রূপ ও পরিবর্তন ফুটিয়ে তোলা যায়।

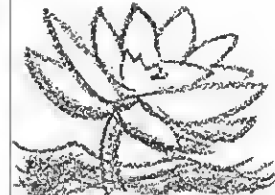
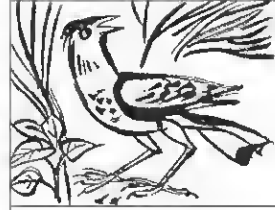
কলি-কলয় : 'চাঁদিনিহ ইকল' বলি আমরা একদম কালো কালিকে। লম্বত চীন দেশের লোকেরা এই কালি প্রথম ব্যবহার করে। প্রথম ব্যবহারের কথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও চীনা প্রাচীন ছবি থেকে বুঝে বর্তমানকালের ছবি দেখলে বুঝা যায় কালো কালি ব্যবহারের প্রধান ভাস্কর্যের ছবিতে খুব বেশি। কালো কালি ও সাধারণ নিব্বল কলম দিয়ে সুন্দর ছবি আঁকা যায়। তাই এই ছবি হর সম্পূর্ণ রেখা-প্রধান। নিব্বল কলমের যতো দুই-কলম বা দুই-শিখ খিনতে পাওয়া যায়। নিব্বলরও কলম বালিরে নিতে পার। বাঁপের সন্ম কলি বা খালের সন্ম পাই কেটে তা দিয়ে সুন্দর কলম বানানো যায়। আমাদের দেশের বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিন তাঁর অনেক ছবি আঁকেছেন এই বাঁপের কলম ও কালো কালি দিয়ে।

সাদা-কালো : সাদা-কালো ছবি আঁকা যায় খারো কিছু মাধ্যমে। যেমন-কঠকলা (চারকোল), ক্রেন ও কালো রঙের মার্কিং কলমে। কোয়ার্টের ব্যক্তি সাধারণ কঠকলা দিয়ে আঁকার চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে এ কঠকলা ছবি আঁকার জন্য খুব উপযোগী নয়। ছবি আঁকার জন্য একরকম নরম ও সূক্ষ্ম কাঠি দিয়ে কলা তৈরি হয়ে থাকে এগুলোকে চারকোল বলে। কাঁপ, রং ও শেনসিলের পোকানে খোঁজ করলে পেরে যাবে। কঠকলা দিয়েও কখনো যাবে, কখনো রেখা টেনে ছবি তৈরি করা যেতে পারে। তবে কঠকলা বা চারকোল দিয়ে আঁকা ছবিকে স্থায়ী করার জন্য একরকম তরল পদার্থ ছবির উপর স্প্রে করে দিলে কলার গুঁড়ো পড়ে যায় না। ফিক্সেটিভ (Fixative) নামে এই তরল পদার্থ রঙের পোকানে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। মোদের যতো কালো ও যেটে রঙের এক ধরনের ছোট কাঠির পাওয়া যায়। তাহলেই ক্রেন বলে। ক্রেন দিয়ে যবে যবে সুন্দর সাদা-কালো ছবি আঁকা যায়। মার্কিং কলম, কালোরং ও অনেক রঙের হয়ে থাকে। কালো মার্কিং কলম সিলনেসর কলম দিয়ে রেখার পর রেখা টেনে সাদা-কালো ছবি আঁকা যায়।

জরও অনেক মাধ্যমে সাদা-কালো ছবি তৈরি হতে পারে। যেমন-খুঁখু কালো রং দিয়ে, জলরং মাধ্যমে এক কালো ও সাদা পোস্টার রং দিয়ে।

ছবি আঁকার রং

বিশুদ্ধ রঙ ছবি আঁকা যায়। ছবি আঁকার মাধ্যমে রং সম্পর্কে প্রথমেই আমরা একটু জেনে নিই। হলুদ, লাল ও নীল এই তিনটিই হচ্ছে প্রাথমিক রং। হলুদ ও লাল মিশিয়ে হয় কমলা রং লাল ও নীল মিশিয়ে হয় বেগুনি, নীল ও হলুদ মিশিয়ে হয় সবুজ। সুতরাং কমলা, বেগুনি ও সবুজ রঙকে বলাতে পারি মাধ্যমিক রং। মাধ্যমিক রঙের যতো প্রাথমিক রঙের তিনটি রঙকে পরিমাণের ভারতম্য ঘটিলে প্রয়োজনযতো অন্যান্য রং তৈরি করা যায় যেমন- উজ্জ্বল সবুজ রং পেতে হলুদ রঙের



উপরে ছবিকে, বাঁপে প্যাস্টেলে বা ক্রেনে এক নিচে কালি-কলমে আঁকা তিনটি ছবি।

ভাগ বেশি এবং নীলের ভাগ কম মেশালে তা পাওয়া যাবে। খয়েরি রং তৈরি করার জন্যে লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি রঙের তরতরম ঘটিয়ে মেশাতে হবে। প্রাথমিক রং থেকে একদম কাশো রং তৈরি করা সম্ভব না হলেও কাছাকাছি গাঢ় রং তৈরি করা যায়। তবে প্রাথমিক রং হলুদ, লাল ও নীল এই তিনটি রং দিয়ে মোটামুটি একটি রঙিন ছবি আঁকা সম্ভব।

জলরং : পানি মিশিয়ে যে রং দিয়ে ছবি আঁকা হয় এবং যে রং স্বচ্ছ তাকেই জলরং বলা হয়। পানি মিশিয়ে অস্বচ্ছ রং দিয়েও ছবি আঁকা হয় কিন্তু সেগুলোকে জলরং বলা হয় না। স্বচ্ছ রংকেই জলরং বলা হয়। স্বচ্ছ রং হলো একটি রং লাগাবার পর তার উপর আরেকটি রঙের প্রলেপ পড়লে নিচের রঙটি হারিয়ে যায় না। আগের রং ও পরের রং দুটোরই অস্তিত্ব অনুভব পাওয়া যায়। বাংলার শুভরে চারকোশা ‘কেক’ হিসেবেও পাওয়া যায়। ট্যাবলেট হিসেবেও এই রং তৈরি হয়ে থাকে। রঙের দোকানে যে পাউডার রং পাওয়া যায় তা পানি দিয়ে গুলিয়ে ছবি আঁকার জন্য জলরং হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ফটো রং করার জন্য একরকম রঙিন কাগজ পানি দিয়ে ভিজিয়ে জলরং হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ রং কাচের শিশিতেও পাওয়া যায়। দুই-একটি কালি হিসেবে বিভিন্ন রঙের কালি কাচের শিশিতে পাওয়া যায়। এ রং দিয়েও জলরঙের ছবি আঁকা যায়। দোকানে কাচের শিশিতে পোস্টার রং পাওয়া যায়। এ রং অবশ্য অস্বচ্ছ রং। তবে জলরং ছবি আঁকার জন্য এ রং ব্যবহার করা চলে। জলরঙে সাধারণত সাদা রং ব্যবহার করা হয় না এবং ভুলি ও রং দিয়ে কাগজে বেশি ঘষাঘষি করা যায় না। দুটি বা তিনটি প্রদেপে (ওয়াশে) ছবি আঁকতে পারলে ছবি সুন্দর হয়।

পোস্টার রং : পোস্টার রং অস্বচ্ছ জলরং। অস্বচ্ছ জলরং হলো একটি রঙের উপর অন্য রঙের প্রলেপ দিলে আগের রঙটি সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। আগের রঙের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। পোস্টার রঙের মতোই আরেকটি মাধ্যম রয়েছে ‘টেম্পারা’ নামে। টেম্পারা রঙে ছবি আঁকার সময় বিভিন্ন রঙের স্কেল সাদা রং মিশিয়ে রঙকে হালকা করা যায়। জলরঙের সাথে সাদা রং মেশালে রঙের স্বচ্ছতা থাকে না। পোস্টার ও টেম্পারা রং এক রং দিয়ে আরেক রঙকে সহজেই ঢেকে দেওয়া যায়। যতবার রং দরকার লাগলো যায়।

পাউডার রঙের সাথে সাদা গুজের আঁঠা বা এরাবিক গাম মিশিয়ে এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যায়। পাউডারের সাথে ডিমের কুসুম মিশিয়ে রঙিন ছবি আঁকা যায়। রং তরল করার প্রয়োজনে ডিমের কুসুমের সাথে পানি মেশাতে হয়। এই পদ্ধতির নাম ‘এগ টেম্পারা’। এগ টেম্পারায় কাগজে যেমন ছবি আঁকা যায় তেমনি কাপড়ে, কাঠে ও হার্ডবোর্ডের উপরও আঁকা যায়। প্রাচীনকালে মিনিয়েচার ছবি (ছোট ছবি) এই পদ্ধতিতে আঁকা হতো। এই পদ্ধতিতে আমাদের দেশের অনেক শিল্পীই ছবি এঁকেছেন। শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত ছবি ‘সত্যাম’ এই পদ্ধতিতে আঁকা।

জলরং, পোস্টার রং, টেম্পারা ইত্যাদি মাধ্যমগুলো সাধারণত কাগজে আঁকতে হয় এবং এগুলোই কাগজে ছবি আঁকার প্রধান কয়েকটি মাধ্যম। আরও কিছু মাধ্যম রয়েছে যেমন— রঙিন মার্শিং কলম, চক ও মোমপ্যাস্টেল, রঙিন পেনসিল ইত্যাদি।

রঙিন মার্শিং কলম : বিভিন্ন রঙের মোটা ও সরু মার্শিং কলম পাওয়া যায় ছবি আঁকার জন্য। এগুলো কাগজে ঘষে লাইন টেনে সুন্দর রঙিন ছবি তৈরি করা সম্ভব। প্যাস্টেলে ছবি আঁকার কাগজ একটু খসখসে হলে ভালো হয়।

তেলরং : তেলরং সাধারণত টিউবে বা কৌটায় নরম পেস্টের আকারে পাওয়া যায়। তিসি তেল ও ভারপিন মিশিয়ে এ রং ব্যবহার করতে হয়। এ রঙে ছবি সাধারণত ক্যানভাসে, হার্ডবোর্ডে, কাঠে আঁকা হয়ে থাকে। তবে বিশেষ ধরনের কাগজেও আঁকা যায়। ছবি আঁকার ক্যানভাস হলো একটু মোটা সূতায় ঘন বুনের কাপড়। রঙের দোকানে রঙিন অক্লাইড পাউডার হিসেবে পাওয়া যায়। তার সাথে তিসি তেল ও ভারপিন মিশিয়ে তেলরং তৈরি করা যায়। তেলরঙের ছবি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। যুগ যুগ ধরে এ মাধ্যমের ছবি টিকিয়ে রাখা যায়। দেশ বিদেশের গ্যালারিতে চিত্রশালা কয়েক হাজার বছরের পুরনো ছবি এখনো অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে।

नमूना प्रश्न

बहुनिर्वाचन प्रश्न

- | | | | |
|----|--|------------------------|---------------------|
| ১। | পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে কয়টি আকৃতিতে বোলা যায়? | ক. একটি | খ. দুইটি |
| | | গ. তিনটি | ঘ. চারটি |
| ২। | আলো-ছায়াকে মোটামুটি কয়ভাগে ভাগ করা যায়? | ক. একভাগে | খ. দুইভাগে |
| | | গ. তিনভাগে | ঘ. চারভাগে |
| ৩। | কোলাজ ছবি কীভাবে তৈরি করা যায়? | ক. কাগজ ছিঁড়ে ও কেটে | খ. কাঠ কেটে |
| | | গ. কাঠ খোদাই করে | ঘ. কাগজে রং লাগিয়ে |
| ৪। | ইজেল হলো— | ক. ছবি আঁকার বোর্ড | খ. রং করার প্রেট |
| | | গ. ছবি আঁকার স্ট্যান্ড | ঘ. ছবির ফ্রেম |
| ৫। | সুন্ডাম ছবিটি কোন শিল্পীর আঁকা? | ক. কামরুল হাসান | খ. এস. এম সুলতান |
| | | গ. জয়নুল আবেদিন | ঘ. হাশেম খান। |

व्यवहारिक

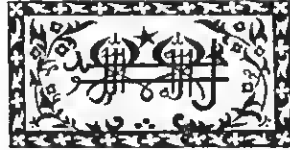
- ১। রঙিন টুকরা কাপড় জোড়া লাগিয়ে কেটে-ছেটে একটি চিত্র তৈরি কর।
- ২। রঙিন কাগজ কেটে তোমার ইচ্ছেমতো ছবি বানাও। মাপ- ১৫ X ২০ ইঞ্চি।
- ৩। ছোট বড় কার্টের টুকরা দিয়ে একটির সাথে আরেকটি লাগিয়ে তোমার ইচ্ছেমতো একটি ভাস্কর্যশিল্প তৈরি কর।
- ৪। শোহার তার বাকিয়ে জোড়া দিয়ে নিচের যে কোনো একটি বিষয়ের রূপ সৃষ্টিয়ে তোলা :
ঘোড়া, হরিণ, মানুষ।
- ৫। শোহার তারে বা বাঁশের চটায় ঝড় পেঁচিয়ে একটি ঘোড়া বানাও।
- ৬। নুড়ি পাখর দিয়ে তোমার পছন্দমতো একটি ভাস্কর্যশিল্প তৈরি কর।
- ৭। যে কোনো দু-তিনটি খেলনা জিনিসের সমন্বয়ে তোমার ইচ্ছেমতো ছোটখাটো ভাস্কর্য তৈরি কর। সময়-৩ দিন।

পঞ্চম অধ্যায় ব্যবহারিক শিল্পকলা

পাঠ : ১, ২ ও ৩

বর্ণমালা ও হাতের লেখা (Typography & Calligraphy)

বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কিছু সাধারণ বর্ণমালার চেহারার সাথে আমাদের সবারই পরিচয় আছে। অনেক দিন আগে যখন সিসার টাইপ ব্যবহার হতো হরফের চেহারা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে সেগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল। যেমন— বাংলা হরফে— বিপ্যাসাগর, রোমান, সুবুপা, প্রগতি, সুশ্রী, আধুনিক ইত্যাদি। ইংরেজিতেও ছিল টাইমস, রোমান, ইউনিভার্স প্রভৃতি। বাংলা হরফে সিসার আগে ব্যবহৃত হতো কাঠের টাইপ। পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন এই কাঠের টাইপের আবিষ্কারক।



* * *
MOBARRAK
* * *
সৈদ মোবারক

বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রযুক্তির ধাপে ধাপে উন্নতির কারণে বর্তমানে সিসার টাইপের ব্যবহার ও লেটার প্রেসের মুদ্রণ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। দ্রুত জাহাঙ্গা দখল করে নিচ্ছে— অফসেট মুদ্রণ, ফটোটাইপ ও কম্পিউটার। ফলে টাইপের চেহারার পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। প্রযুক্তি ও কম্পিউটারের কারণে হরফের চেহারা, আকার—আকৃতি যত দ্রুতই পরিবর্তন হোকনা কেন মূল চেহারাটা ভেরি করে নিচ্ছে শিল্পীরাই। সেই অসিকাল—কাঠের হরফের আমল থেকে বর্তমান কম্পিউটার যুগ পর্যন্ত হরফের মূল চেহারাটা শিল্পীদের হারাই সম্পন্ন হচ্ছে।

হরফের শিল্পরূপ রঙ করতে হয়। এর জন্য গ্রন্থাজ্ঞান কিছুদিন নিয়মিত অনুশীলন করা। কিছু ভালো ও দেখতে সুন্দর হরফের বুদ্ধি অনুকরণ করে যেতে হবে। তারপর নিজের ভাবনা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে হরফকে আরও কতরকম নতুন নতুন

একুশে
যক্ষ্ময়ারি

সবদিন যেও পড়ে
আমি এই দিনে
বাৎসর্য নয়ন ন্যূন
অশ্রুতিনি
এম উৎসবে এই নয়
দৃষ্টি পড়ে উঠে যেম অজ
যায়ে পদ্য রত
যেন, পুণ্ডিত ভীষ্ম প্রথা
সর্বত্র গারানো শিখা
তবে ওও তথা
অমর গানের মুখে
একুশে যক্ষ্ময়ারি
অমি কি ভূমিতে পাঠি
পড়ে না ভূমিতে কেই
তোম জননে তোম দিনে
যিশ্ব রক্তন ওরিয়ে এই দিনে
রক্ত রক্ত আঁখি পড়ে অশ্রুতে পনামে
সুচিহ্না কামান

ভুলি দিয়ে তিন রকম হাতের লেখা

চেহারা পেরা দার তা মিছেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হয়। আপনই বসেছি হরেকের বত রকম চেহারা ও শিল্পরূপ তা শিল্পীরাই করেছেন। হরেকের কিছু নথুনা, ছবি ও নিয়ম সংগ্রহ করে তা সেখে কিছুদিন নিয়মিত অনুশীলন করে গেলে—সুন্দর করে বাংলা, ইংরেজি লেখার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লেখার বা ফরাসের শিল্পরূপ দিতে পারানন্দী হতে পারবে।

মোদের গাব্ব মোদের আশা আমরি বাংলাভাষা

- অখুল প্রসাদ সেন

মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই
সে মানুষ নহে।
- মীর মোশাররফ হোসেন

মে সবে বপ্তিত জন্মি হিজি বঙ্গবানী।
মে সব বাহ্যিক জন্ম নির্মল ন জ্ঞান ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জন্মায়।
নিজ দেশ ভাঙ্গী কেন বিদেশ ন শ্রাম ॥
মাতা পিতামহ একমে বপ্তিত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত জতি ॥

- আবদুল হাকিম

দুশি দিহা তিন রকম হাতের লেখা

প্রচারের জন্য পোস্টার তৈরিতে, হোষ্টিং এ সুন্দর লেখার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞাপনের জন্য টেলিভিশনের প্রচারে, সিনেমার জন্য নানারকম নকশার, লেখার প্রয়োজন। বই পুস্তকের গ্রন্থদে, খবরের কাগজে, সাইনবোর্ডে, নাম ফলকে এমনকি রাজনৈতিক প্রচারের জন্য দেয়ালে লেখার প্রয়োজনে হরফের নানারকম শিল্পরূপ দেয়া হচ্ছে। বাণিজ্যিক শিল্পদ্রব্য যেমন ঔষধের বোকে, মোড়ক বা প্যাকেট, দুধ, বিস্কুট ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, প্রসাধন দ্রব্য-সাবান, তেল, দোশন ইত্যাদির প্যাকেট এমনি হাজারো কাজে সুন্দর টাইপোগ্রাফি বা লেখাজ্ঞান অতি আবশ্যকীয় একটি শিল্পকর্ম।



কয়েকটি ইসলামি ক্যালিগ্রাফি

হস্তলিপি বা হাতের লেখাও একটি শিল্পকর্ম। মুদ্রণশিল্পের আবিষ্কারের আগে যাবতীয় লেখালেখির কাজ হাতের লেখা দিয়েই হতো। রাজা বাদশার স্বাক্ষর জারি-দলিল দস্তাবেজ, পুঁথি লেখা, বই লেখা, ধর্মগ্রন্থ লেখা সবই হস্তলেখা বিশারদদের দ্বারা হতো।

বাংলা হস্তলিপির পুরোনো পাণ্ডুলিপি। তাল পাতার পুঁথি, দলিল দস্তাবেজের নিদর্শন আমাদের জাতীয় জাদুঘরের সজ্জায়ে রয়েছে। সুন্দর আরবি লিপিতে আছে কুরআন শরীফ। সারা পৃথিবীতেই সুন্দর আরবি হস্তলিপিতে অনেক কুরআন শরীফ রয়েছে। আরবি হস্তলিপিতে ইসলামের অনেক মর্মবাণী বিশেষ চিত্রকলা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। যাকে বলা হয় ক্যালিগ্রাফিচিত্র এবং যা ইসলামিক শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যময় দিক। যারা হাতের লেখায় পারদর্শী তাদের বলা হয় ক্যালিগ্রাফার। আরবি, ফারসি, উর্দু এসব ভাষায় অনেক শিল্পী ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে সুন্দর ছবি করেছেন মুঘল ও পারশিক চিত্রকলায়।

ক্যালিগ্রাফি করতে যেয়ে অনেক শিল্পী লেখাকে বিভিন্ন জীবজন্তু, পাখি, গাছ এসবের অবয়বে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাখরের গায়ে খোদাই করা বেশ কিছু আরবি ক্যালিগ্রাফির নিদর্শন জাতীয় জাদুঘরের সজ্জায়ে রয়েছে। বাংলাদেশের পুরোনো কিছু মসজিদের গায়েও ইসলামি শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন হিসেবে এই ক্যালিগ্রাফি রয়েছে।

হাতের লেখার বা ক্যালিগ্রাফির পুস্তক এখনো রয়েছে। যেমন অনেক দলিল দস্তাবেজ হাতে লেখা হয়। কাউকে শ্রদ্ধা জানাতে মালপত্রটি সুন্দর হাতের লেখায় তৈরি করার রেওয়াজ এখনো আছে। বিয়ে, জন্মদিন ও আলম্প অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপি হাতে লিখে দেওয়ার নিয়ম সামাজিকভাবে একটা নান্দনিক সংস্কৃতি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখা খুব সুন্দর। কবিতা শিল্পে গিয়ে কবিতার লাইনে কাটাকুটি করে হাতের লেখা ও কাটাকুটির রেখা মিলিয়ে তিনি ছবির রূপ দিয়েছেন। কবি নজরুলের হাতের লেখাও সুন্দর। অনেকেই তাঁদের হাতের

লেখা অনুকরণ করে নিজের হাতের লেখাকে সুন্দর করার চেষ্টা করেন। আমাদের দেশের কল্লেকজন বিখ্যাত শিল্পীর হাতের লেখা অনুকরণযোগ্য। শিল্পী কামরুল হাসান ও শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর হাতের লেখা সবার কাছেই পরিচিত। বাংলাদেশের সর্ববিধান গ্রন্থের প্রেসের টাইপ ব্যবহার না করে পুরো গ্রন্থটি হাতে লেখা হয়েছে। লিপিকর হলেন শিল্পী আবদুর রউফ। সর্ববিধান গ্রন্থটি ক্যালিগ্রাফি, অন্যান্য নকশা ও চিত্রের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য শৈল্পিক গ্রন্থ। হাতের লেখা সুন্দর করার কিছু নিয়ম এবং ক্যালিগ্রাফির কিছু নিদর্শন এখানে ছাপা হলো। ভালো করে লক্ষ করলে এবং নিয়মিত অভ্যাস করলে তোমরাও ভালো হস্তলিপি বিশারদ বা ক্যালিগ্রাফার হতে পারবে।

পাঠ : ৪, ৫ ও ৬

নকশা (Design)

নকশা বা ডিজাইনের প্রয়োজন ও ব্যবহার মানব জীবনের সর্বত্র। অবশ্য 'নকশা' শব্দটির অর্থ ব্যঙ্গক এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত। আমরা এখানে কিছু সাধারণ আকার-আকৃতি, ফুল, পাতা, পাখি, মাছ ও রেখা মিলিয়ে কাগজে নকশা তৈরির কলা আলোচনা করব যা আমাদের দৈনন্দিন কাজে জীবনযাপনের প্রয়োজনে সব সময় ব্যবহার হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের লোকশিল্পে নকশার ছড়াছড়ি। নকশিকথা, পাখা, জায়নামাজ, তাঁতে তৈরি শাড়ি-বিশেষ করে জামদানি, টাঙ্গাইল শাড়ি, ঢাকাই খিট শাড়ি, কাতান, বেনারসি ইত্যাদিতে হাজার হাজার নকশার ব্যবহার হয়েছে নানা রঙে। এসব নকশা তাঁকার পদ্ধতি ও ব্যবহার ভাষাভাবে লক্ষ করা। কাঠের কাছে- দরজায়, খাট-পাখি তৈরিতে, বাজে সিন্দুকে, বিভিন্ন আসবাবপত্র, পাকিতে, নৌকায়, কাঠ খোদাই করে উঁচু উঁচু করে নানারকম নকশার কাজ আছে বাংলাদেশে। যেগুলোকে রিলিফ শিল্পকর্ম বলে। পোড়ামাটির ফলকেও এ ধরনের রিলিফ শিল্পকর্ম করা হয়। যার কথা মাটির শিল্পকর্ম অধ্যায়ে কলা হয়েছে। এসব শিল্পকর্ম গভীর মনোযোগ সহকারে দেখ- অনেক নকশার সাথে তোমাদের পরিচয় হবে।

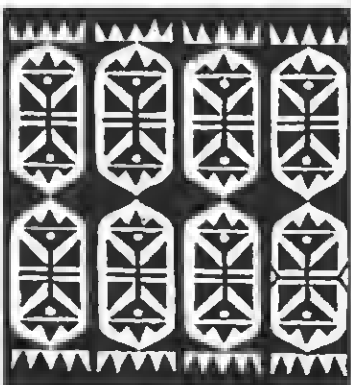
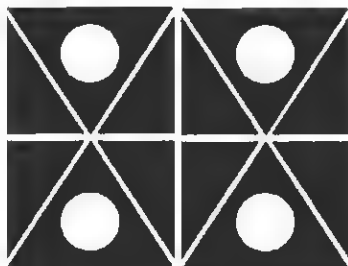
কাঠের পুতুল, হাতি, খোঁড়া, মাটির পুতুল, ইড়ি-কলসি, শখের ইড়ি, কাঁসা পিডলের তৈজসপত্র, সিলমসি, ফুলদানি, গোলাপজলদানি, সুরমাদানি, সিন্দুরপাত্র, অলঙ্কার রাখার পাত্র, সোনা-রুপার অলঙ্কার-এমনি সব ব্যবহারিক প্রব্যো ডিজাইন ও নকশার ছড়াছড়ি দেখতে পাবে।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে রাস্তায় 'আলপনা' জাঁকা ডায়াপহিনদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একটি বিবয়। আজকাল যে কোনো বিয়েতে, জন্মদিনে, ঈদে, পূজায় ও প্রায় সব আনন্দ অনুষ্ঠানে আলপনা জাঁকা হয় যা বাংলাদেশের লোকশিল্পের সুন্দর নিদর্শন এবং ফুল, পাতা, গাছ, পাখি ও রেখার মিলিত নকশার রূপ।

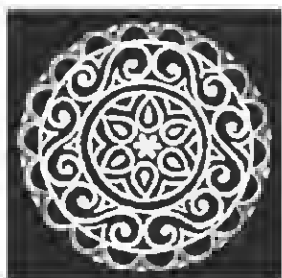
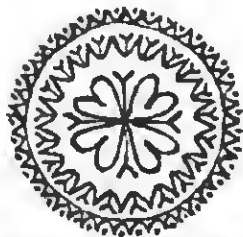
বৃক্ষ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও রেখা এই চারটি উপাদান নকশা তৈরির প্রধান অবলম্বন। এই চারটি উপাদানকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে তুমি অনেক রকম নকশা তৈরি করতে পার। ছবির নকশাগুলো ভালোভাবে লক্ষ কর একই উপাদান ও রেখা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার, নানা ডিজিতে বসিয়ে নকশায় ছন্দ ও সুর সৃষ্টি করা হয়েছে। কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলি। শব্দের সঙ্গে শব্দের মিল ঘটিয়ে কবিতা ও গানে আমরা যেমন ছন্দ ও সুরের সৃষ্টি করে মনকে আন্দোলিত করি তেমনই নকশা বা ডিজাইনে বিভিন্ন উপাদান পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে চোখের লেখায় শৃঙ্খল সুন্দর রূপ নয় একটা ছন্দ ও সুর সৃষ্টি হয়ে যায় ছন্দে।

নৃত, ক্রীড়ন, চতুর্ভুজ ও প্রভৃৎ এই চরিত্র উপলক্ষ ইন্দ্রিয়িক শিল্পকলার প্রথম উপলক্ষ। ইন্দ্রিয়িক শিল্পকলার শীলকলার মধ্যময় সাধারণত করা হয় না। অতিথিতিক শাটিন্দ্রিয়লই প্রকল্য পেয়েছে।

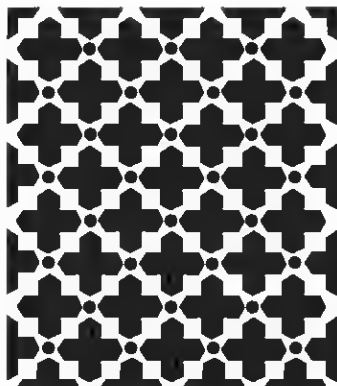
যাকারসেই ইন্দ্রিয় শ্রাব্যকলার শিল্পনি বিভিন্ন মনস্বিন ও ইন্দ্রিয়কলার তৈরিতে উপলক্ষ অতিথিতিক শাটিন্দ্রিয়লোক দান্যভাবে মনস্বিন করে বিভিন্নকল মনস্বিন কল করা হয়েছে।



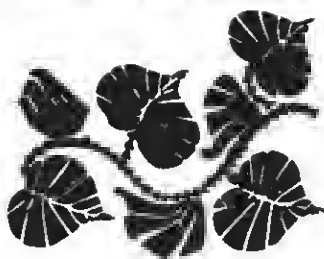
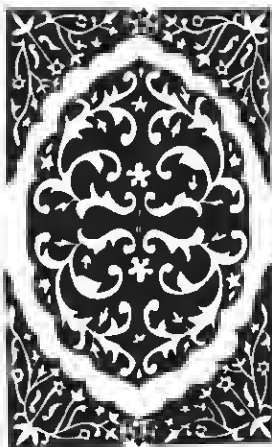
অতিথিতিক শাটিন্দ্রিয় মনস্বিন, বিভিন্ন কল এই
মনস্বিন মনস্বিন করা কল পেয়ে



মিন কলার তিনটি মনস্বিন



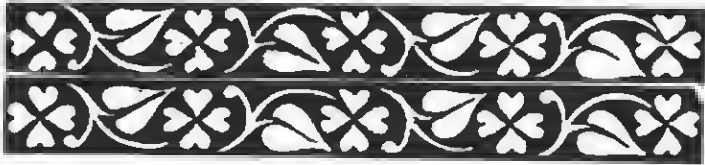
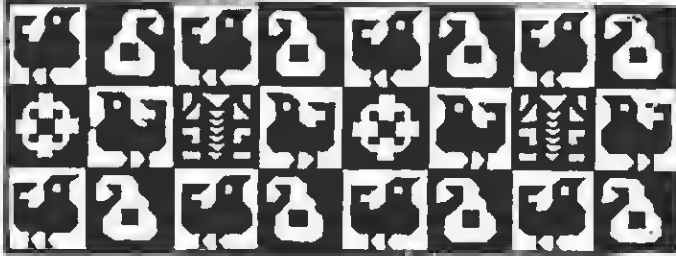
জ্যামিতিক প্যাটার্নে একটি ইসলামিক নকশা।



ফুল, লতাগাতা দিয়ে তুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে ব্যবহার করে অনেক রকম নকশা করা যায় এবং তা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়।



ফুল ও লতাগাতা দিয়ে দুটি নকশা।



পাখি, ফুল ও পতাকাবস্তুর দুটি নকশা

এখানে আধিকৃত পটচিত্রগুলোর নানারকম ব্যবহার দেখানো হয়েছে। তোমরা এভাবে চেষ্টা কর-সেখ কত রকম নকশা তৈরি করতে পার। উপরের ফুল, পাখা, মাছ, পাখি দিয়ে নকশা করার নিয়মগুলো দেখে অভ্যাস কর। নতুন ও সুন্দর নকশা তোমরাও তৈরি করে নিজেদের কাঁজে ও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পার। যেমন- কাপড় ছাপার, আলনা আঁকার, বই পুস্তকের প্রচ্ছদে, পোস্টার, সেরাল পত্রিকার, লায়ব্রারিসিতে, ইনকার্ড ও বিভিন্ন কাঁচাশিল্পে।

পাঠ : ৭, ৮ ও ৯

গ্রাফিক ডিজাইন (Graphic Design)

হাত বা প্রকাশনার জন্য যে ডিজাইন বা নকশা করা হয় তাতেই আমরা গ্রাফিক ডিজাইন বলতে পারি। সারা বিশ্বের প্রকাশনার জন্য এই গ্রাফিক ডিজাইনের আওতাভুক্ত। বই-পুস্তক ও ব্যাপারিসের প্রকাশনা, প্রচ্ছদ, ক্যাপসুল, বিভিন্ন পণ্যের প্যাকেট ডিজাইন থেকে শুরু করে হাণ্ডব্যাগ থেকে মুদ্রিত বিভিন্ন প্রকারপাখুর পোস্টার, অ্যাডা বিজ্ঞানের জন্য নকশা, ছবি ও সামগ্রিকভাবে মুদ্রিত বিষয়ের আভিনব ও সৌন্দর্য নির্ভর করে ফুলত এই গ্রাফিক ডিজাইনের উপর। সুতরাং গ্রাফিক ডিজাইন হলত পুরুষপূর্ণ একটি বিষয়।

কম্পিউটার আধিকার বা এর ব্যাপক প্রচলন এর পূর্বে প্রকল্প গ্রাফিক ডিজাইনের হাণ্ডব জন্য প্রকৃতকৃত উপায়ে প্রায় সবকিছুই হাতে তৈরি করতেন। ছবি, নকশা ও পেশার পেশী বা স্টাইল সবই রং কালি, ছুঁপি, বিভিন্ন প্রকার কলম ইত্যাদি দিয়ে প্রকল্প করা হতো। এখনকার প্রায় প্রায়, কলম, কলম ইত্যাদিও নকশার জন্য ব্যবহার করা হয়।

টাইপোগ্রাফির ব্যবহার গ্রাফিক ডিজাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। টাইপোগ্রাফি হচ্ছে প্রচ্ছদ, ক্যালেন্ডার, পণ্যের মোড়ক বা অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ছাপার অক্ষর বা হরফ এর স্টাইল। বিভিন্ন স্টাইলের লেখা গ্রাফিক ডিজাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য প্রয়োজন পোস্টার রং, চাইনিজ ইঙ্ক, বিভিন্ন মাগের জুঁলি, কম্বাস, কাগজ, পেনসিল ইত্যাদি। এখন কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে এসেছে চমকপ্রদ পরিবর্তন। কম্পিউটার গ্রাফিকস এখন একটি বহুল পরিচিত শব্দ।



শিল্পী সন্দীপ দাস অপুর আঁকা একটি পোস্টার



শিল্পী হাশেম হান্নের ছবি দিয়ে করা একটি বইয়ের প্রচ্ছদ

কম্পিউটার গ্রাফিক শেখার জন্য আজকাল বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ছাপার জন্য ব্যবহৃত যাবতীয় নকশা এখন একজন গ্রাফিক ডিজাইনার বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটারের মাধ্যমেই সম্পাদন করে থাকেন। এর ফলে মুদ্রণে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। সারা বিশ্বের মুদ্রণশিল্প এখন কলা যায় উন্নতির চরম শিখরে বিরাজ করছে। তাই ছাপা সজ্জার বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিল্পীর উপর সমগ্র দেশের মুদ্রণ শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সুতরাং একজন দক্ষ গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করা সম্ভব।

পাঠ : ১০, ১১ ও ১২

ফ্যাশন ডিজাইন (Fashion design)

চলতি প্রথা, রীতি বা স্টাইলকে ফ্যাশন কলা হয়। এটি হতে পারে পোশাক, আসবাব অথবা গয়নাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এমনকি হেয়ার স্টাইলও এর বাইরে নয়। তবে Fashion (ফ্যাশন) শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয় পোশাকের ক্ষেত্রেই। আর ফ্যাশন ডিজাইন বলতেও আমরা বুঝি কোনো বিশেষ অঙ্গলের জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত পোশাকের জনপ্রিয় আকার-আকৃতি ও প্রস্তুতপ্রণালি।

ক্যানশন শব্দটির অভিধানিক বর্ণ্য প্রচলিত রীতি। সময়ের সাথে সাথে এ রীতির পরিবর্তন হয়। তাই একে আমরা সময়োপযোগী রীতিতে কলতে পারি। সভ্যতার সাথে ভ্রমকর্ম্যমান সফকৃতির পরিবর্তন ঘটছে তুলে তুলে। পরিবর্তন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, কখনো বা সদ্ভাবখন-বিদ্রোখন নিয়ে ক্যানশন চলে এসেছে সময়ের সাথে সাথে।



একটি টি-শার্ট এক একটি সলোয়ার-কমিজের নমুনা

যেমন- কখনো হয়তো মিসেতলা পোশাক পরতে মানুষ পছন্দ করে, তখন সবাই ঐ ভকম পোশাক পরে এবং ঐটাই ভকনকার ক্যানশন। আবার কখনো বীটিসিটি পোশাক জনপ্রিয় হয়। সুতরাং ভটাই সে সময়ের ক্যানশন। এ অন্য ক্যানশন গীর্ণশায়ী নয়।

বিতিন্ন দেশের ক্ষেত্রে এই ক্যানশন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বা মর্যাদা প্রকাশ করে। উনিশ ও বিশ শতকে ক্যানশনকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে ক্যানশন হাউস ও ক্যানশন ব্যাপারিসনের সময়মা ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ মানুষের জীবনমাত্রার মান বেড়েছে। আর তার সাথে পাছা দিয়ে বেড়েছে মানুষের ক্যানশন সচেতনতা।

পাচাত্তো ও আমেরিকতে ক্যানশনেক পোশাক রুজগী করে ব্যাকদেশেও ব্যাক তার অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করে গড়ে তুলেছে। আমাদের দেশের পার্ফেক্টন ইত্যাদিগুলো পোশাক ও পোশাকের ক্যানশনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। তাই পোশাক প্রস্তুতকারী পার্ফেক্টনশনের সর্ভঠন BGMEA নিজেয়াই একটি ক্যানশন ডিজাইন শিকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তাছাড়াও বিভিন্ন কোমরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্যানশন ডিজাইনের উপর রীতিমতো জিরা দেয়া হচ্ছে। পোশাক যে একটা শিল্প, একটা ব্যাক আর ব্যাকর ব্যাপেকা রাখে না। শ্রেণি, পেশা, বয়স, সামাজিক অবস্থানভেদে সবার কায়েই ক্যানশনেক পোশাক এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাজেই একে এখন আর কেবল পথ কাা ব্যবহা না। ব্যাক পোশাকের সাথে মিশিয়ে জুতা, স্যাকেল, হ্যাট, টুপি, গল্লা, হাতা সবই এখন হল্লা চাই ক্যানশনেক।

ভাবে ক্যানশন বক্যাই হতে হবে নিজ নিজ সমাজ, সফকৃতি, আবহাওয়া ও অর্থনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাকদেশে এখন প্রচুর ক্যানশন হাউস হয়েছে। আর নিজানতুন ডিজাইনের পোশাকের সমাহারও ব্যাকরে লভ করা আছে। তাই

ফ্যাশন ডিজাইনারের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। পিছলুটি, সঠিকভাবে রঙের সমন্বয়বোধ ও স্টাইলিশ পোশাক সম্পর্কে ধারণা এই পেশাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

এর সাথে সম্পৃক্ত আছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আবহমান বাংলার লোকায়ত ধারা, আমাদের রুচি, মূল্যবোধ স্বকীয়তা ইত্যাদি। প্রতিটি জাতির একটা নিজস্ব ধারা বা ঐতিহ্য আছে। আর এই ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে তাদের আচার-অচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গ্লোবাল বিশ্বে এখন আমরা বিশ্ব সংস্কৃতির প্রবাহে আপন সংস্কৃতিকেও হুলে ধরেছি। নিজ সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে কখনো বা পাচাতের ধারার সংমিশ্রণে আমরাও সময়কে ধারণ করেছি বিশ্বায়নের সাথে। এর প্রভাবে আমাদের পোশাকশিল্পেও ঘটেছে ভিন্নমাত্রা। বৈচিত্র্যতা এসেছে তার ডিজাইনে। আমাদের দেশের অনেক ডিজাইনারদের পোশাক বিশ্ববাজারে সমাদৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত তারকা মডেল বিবি রাসপের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি।

দেশীয় তাঁতশিল্পকে উজ্জীবিত করে তাঁতের বোনা কাপড়ে আধুনিক ফ্যাশনে তিনি পোশাক তৈরি করে একদিকে যেমন দেশীয় তাঁতের পুনর্জীবন দিয়েছেন, তেমনি দেশের নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই শিল্পে তাদের মেধা মনন প্রয়োগ করে একটা নতুন ধারার উন্মেষ ঘটান।

বাঙালির ঐতিহ্য ও গৌরবময় উৎসব পহেলা বৈশাখ। ফ্যাশন হাউসগুলো ক্রেতাদের আগ্রহের বিষয়টি বিবেচনা করে প্রতিবছর বৈশাখ বরষের জন্য তৈরি করে আবহাওয়া উপযোগী আরামদায়ক সূতিপোশাক। পোশাকে বণীল হয়ে উঠতে চায় সব বাঙালি।

আবার ২৬শে মার্চ উপলক্ষে লাল-সবুজের বিশেষ আরোজনে মেয়েদের জন্য টপস, সাপোয়ার-কমিজ, ছেলে-মেয়েদের ফতুয়া ও ছেলেদের লানা ডিজাইনের পাঞ্জাবি তৈরি করে। মহান ভাষার মাসে আমাদের ভাষার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশ করে আমাদের প্রিয় বর্ণমালা দিয়ে ছোট বড় সবার জন্য নানারকমের হুচিশীল পোশাক তৈরি করে। আবার প্রকৃতিতে যখন ফাগুনের আগমন ঘটে তখন তাকে বরণ করতে ফ্যাশন হাউসগুলো বাহারি পোশাকে আমাদের মনও রাঙিয়ে তোলে।

আমাদের জাতীয় দিনসমূহ, ধর্মীয় উৎসবে অথবা বাঙালির ঐতিহ্যময় দিনগুলোতে নিতানতরুন বরং এর নতুন নতুন ডিজাইনে পোশাকশিল্পে একটা আধুনিক ধারা তৈরি হয়েছে। এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে একজন চারু ও কারুশিল্পীর বিশাল ভূমিকা থাকে। কারণ তেমনা ইতিমধ্যে মে সকল নকশা বা ডিজাইন শিখে তার বহুমাত্রক প্রয়োগ ও পোশাকের ডিজাইন এর সমন্বয় করে ভূমিগত হয়ে উঠতে পার একজন সফল ফ্যাশন ডিজাইনার।

পাঠ : ১৩, ১৪ ও ১৫

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা (Interior Decoration)

আধুনিককালে আবাসগৃহ বা অফিস কক্ষের ভিতরে প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী যে সাজসজ্জা করা হয় তাকে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন বা অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা বলা হয়। সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষ যেমন প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ দেখে দেখে বিমোহিত হয়েছে, তেমনি এ সৌন্দর্যের ছোঁয়া তার অভ্যন্তরীণ জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে অনেক পূর্ব থেকে। এটি যেমন তার সুরুটির পরিচয় বহন করে তেমনি পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সে জীবনযাপনে একধরনের স্বাস্থ্যপথ্যবোধ করে। চারু ও কারুকলা বিষয়টি এ বিষয়ে অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। আজকাল আবাসিক বাসা, অফিস, অন্টেরিয়াম,

বহু বড় স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান, মানা প্রকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শপিংসেন্ট, হোটেল, ফোর্টেল, রেস্টহাউস মানা ক্যাম্প হাউস থেকে শুরু করে অনেক জায়গাই জত্যন্তরীণ সাজসজ্জা করে এর শুভরে একটি নান্দনিক আবহ তৈরি করা হয়, যা দেখে আমাদের মনপ্রাণ, চোখ জুড়িয়ে যায়। সুন্দর পরিবেশে কাজে আসন পাওয়া যায়, মনেও আসন থাকে।



একটি আধুনিক জত্যন্তরীণ গৃহসজ্জার নমুনা

জত্যন্তরীণ সাজসজ্জা সাধারণত বাড়ি বা অফিস কক্ষের ব্যবহারকারীর বিবিধ প্রয়োজন, তার ছুটি, সন্তকৃতি ও আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়। অলকরণ বা সাজসজ্জা শুধু কক্ষসমূহের দেয়াল, মেঝে বা ছাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ভবন বা কক্ষে ব্যবহৃত বৈশুদিক আলো আসবাবপত্র ইত্যাদিও সাজসজ্জার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। যত্নে কোন কোন আসবাবপত্রকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং কোন কোন আসবাবপত্রকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় এ বিষয়টির উপরও সাজসজ্জার সার্থকতা অনেকটাই নির্ভর করে। অভিরিক্ত জিনিসপত্র থাকলে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। সুতরাং আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করে প্রয়োজনের গুরুত্বকে মাথায় রেখে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এছাড়াও দেয়ালের রং এবং মেঝের টাইলস বা কার্পেটের রংও গুরুত্বপূর্ণ। মূলত নূহের জত্যন্তরীণ সাজসজ্জার জন্য রেখা, ঘর, আলো এবং রঙের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। রঙের ব্যবহারের ভারতম্যের কারণে ছোট কক্ষকেও অপেক্ষাকৃত বড় মনে হয়। ছাদের উচ্চতা কখনো বেশি আবার কখনো কম মনে হয়। তাই রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। শয়ন কক্ষের রং হওয়া উচিত হলকা ও সূতিক্কে পীড়া দেয় না এমন। যাতে দেয়ালে চোখ রাখলে আল্লাহবোধ হয়, সমস্তই মনে আসে। পাট উজ্জ্বল রং মনকে উত্তেজিত করে। ফলে তা ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অন্যদিকে কলার ঘরের জন্য কিছুটা উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা ভালো। তাছাড়া নান্দনিকমণ্ডল পেশার দিয়েও ঘরের দেয়ালকে আকর্ষণীয় করা যায়। দরজা, জানাশার পর্দার রং ও গুরুত্বপূর্ণ, যা ঘরের দেয়ালের রঙের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ঘরের কক্ষগুলো স্বতই সুন্দর করে সাজানো হোক না কেন তাতে যদি স্বাভাবিকভাবে আলোর প্রয়োগ করা না যায় তবে পুরোটাই কুখ্য হবে। সুতরাং এটা মনে রাখতে হবে যে, সুন্দর রং নির্বাচন, আকর্ষণীয় পর্দা আর আসবাবপত্রের সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্বাভাবিক ব্যবহার না করার কারণে অসম্পূর্ণ থেকে যায়ে সাজসজ্জার কাজটি। বিভিন্নভাবে ঘরে আলোর প্রয়োগ করা যায়। বাম, শটলাইট, ল্যানশেড, স্ট্যাণ্ড

ল্যান্স প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। সেকেন্ডে বিশেষ বিশেষ কিছু জিনিসের উপর দৃষ্টি আকর্ষিত করার জন্য সেখানে স্টাট লাইটের আলো ফেলা যেতে পারে। যেমন শো-পিস, পেইন্টিং ইত্যাদি। আবার বসার ঘরে পুরো কক্ষকে আলোকিত না করে আলো-আধারির পরিবেশ তৈরি করা যেতে পারে। তাছাড়া সুন্দর সুন্দর ল্যান্সশেডের ব্যবহার ঘরের শোভা বাড়িয়ে তোলে। কেবল যথাস্থানে তা স্থাপন করতে হবে। তবে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা অনেকটাই নির্ভর করে অধিবাসীর দুটি ও চাহিদার উপর। এ বিষয়ে প্রথাগত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কাজকে দৃষ্টিনন্দন, মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় করে করা সম্ভব।

নমুনা প্রশ্ন

গিখে ছবাব দাও

- ১। জামদানি শাড়ি, নকশিকাঁথা, জয়নামাজ, কঠোর দরজায় কী ধরনের নকশা থাকে— বিবরণ দাও।
- ২। মসজিদ, মন্দির ও প্যাগোডায় কী ধরনের শিল্পকর্ম ও নকশা থাকে বর্ণনা দাও।
- ৩। গ্রাফিক ডিজাইন (Graphic Design) কাকে বলে? গ্রাফিক ডিজাইন—এর কাজের দিকগুলো উল্লেখ কর।
- ৪। ফ্যাশন ডিজাইন (Fashion Design) বলতে তুমি কী বুঝ? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফ্যাশনের প্রভাব সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।
- ৫। গৃহ অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার (Interior Design) প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ৬। গৃহ অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় (Interior Design) কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বারোপ করতে হবে, তা উল্লেখ কর।

ব্যবহারিক : হাতে কলমে

নিচের কবিতাংশ সুন্দর হরফে গিখে চিত্রের রূপ দাও।

- ১। মোদের গরব মোদের আশা

আ মরি বাংলা ভাষা

—অতুলপ্রসাদ সেন

- ২। মাক্তাবায় যাহার ভক্তি নাই

সে মানুব লহে।

—মীর মোশাররফ হোসেন

- ৩। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

একুশে ফেব্রুয়ারি

—আবদুল গাফফার চৌধুরী

৪। আমার সোনার বাংলা

আমি তোমায় ভালোবাসি

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বীণা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাধ্যম : কাগজ ও কালো কালি

কাগজের মাপ : ৫ x ৮ ইঞ্চি।

সময় : ২ দিন।

৫। বৃন্দ, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ ও রেখা, এই চারটি উপাদান দিয়ে কাগজের উপর কালো কালিতে একটি নকশাচিত্র আঁক। নকশার মাপ ৫ x ৫ ইঞ্চি।

সময়— ৩ ঘণ্টা।

ফুল, পানি, পাতা ও রেখা দিয়ে কালো রং ও অন্য একটি রঙে কাগজের উপর একটি নকশা চিত্র তৈরি কর।

নকশার মাপ ৫ x ৫ ইঞ্চি।

সময়— ৩ ঘণ্টা।

৬। স্কুলের বাংলা শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে একটি সুন্দর মানপত্র তৈরি কর। মানপত্রে থাকবে হাতের লেখা বা ক্যালিগ্রাফি, লতাপাতা দিয়ে নকশা। মানপত্রের কাগজের মাপ ও কত রঙের করবে তা নিজেই ঠেবে নেবে।

সময়— ৩ দিন।

৭। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের জন্য একটি ৪ পৃষ্ঠার (মাঝখানে ১টি ভাঁজ) আমন্ত্রণলিপি তৈরি কর। কার্ডের মাপ— ৫ x ৬ ইঞ্চি। রং কালো ও যে কোনো ১টি রং।

কার্ডের প্রথম পৃষ্ঠায়— নকশা, স্কুল ও অনুষ্ঠানের নাম।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কিছু নকশা ও অনুষ্ঠানসূচি।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণলিপি।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় নকশা দিয়ে সমান্য অলঙ্কার। প্রেসের কোনো টাইপ ব্যবহার চলবে না। হাতের লেখা ব্যবহার কর।

সময়— ২ দিন।

৮। একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের জন্য রাস্তায় আলপনা করার জন্য একটি ছোট আকারের সাশা-কালো আলপনা কাগজের উপর আঁক। কাগজের মাপ— ৮ x ৮ ইঞ্চি।

সময়— ৩ ঘণ্টা।

নবম শ্রেণির জন্য ব্যবহারিক শিল্প ছবি আঁকা, বর্ণমালা শেখা, নকশা ও গ্রাফিক ডিজাইন

ছবি আঁকা

১। বাস্তব জীবন ও প্রকৃতি থেকে স্কেচ এবং সরাসরি ড্রইং- ক্লাসের সংখ্যা-৫টি। মাধ্যম : পেনসিল ও কালি-কলম। শিক্ষক মাঝে মাঝে ছাত্রদের নিয়ে সরাসরি প্রকৃতির ভেতর যাবেন। কাগজ, বোর্ড, পেনসিল বা কালি-কলম নিয়ে গাছপালা, ঘরবাড়ি, মাঠে, নদীর ঘাটে বা জলাশয়ের পাশে বসে ছবি আঁকার ক্লাস নেবেন। ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতি থেকে যে কোনো বিষয়ে সরাসরি (ফ্রি হ্যান্ড) ড্রইং করবে, স্কেচ করবে- সংখ্যায় যতগুলো সম্ভব একটির পর একটি করে যাবে।

ক্লাস ছাড়াও ড্রইং, স্কেচ সব সময়ই একজন ছবি আঁকিয়ে ছাত্রকে করতে হয়। এ জন্য প্রত্যেক ছাত্রের কাছে সব সময় একটি স্কেচ খাতা রাখতে হয়। সঙ্গে প্রয়োজনীয় পেনসিল বা কলম। যখনই সময় ও সুযোগ পাবে স্কেচ বা ড্রইং করতে হয়। বেড়াতে গেলে, বাজার-হাটে, মাঠে, ট্রেনে-স্টিমারে সর্বত্রই স্কেচ খাতা থাকবে একজন শিল্পীর সার্বজনিক সজ্জা। সব সময় নিয়মিত ড্রইং ও স্কেচ করলে একজন শিল্পী ড্রইং-এ দক্ষ হয়, সাহসী হয়ে ওঠে এবং ছবি আঁকা বিষয়ে জানতে পারে অনেক।

ড্রইং ও স্কেচ ছাড়া প্রকৃতি থেকে বিষয় নিয়ে কাগজের উপর পেনসিল বা কালি-কলমে ধরে ধরে স্টাডি বা অনুশীলন করতে হবে।

এখানে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো-

১। ফ্রি হ্যান্ড ড্রইং স্কেচ ও অনুশীলন।

২। শিরচিত্র। স্টিল লাইফ ক্লাস ৫টি-কলসি, ইট, পাতিল, বোতল, বৈয়াম, গ্লাস, মাটির পাত্র বা যে কোনো পাত্র সাজিয়ে শিরচিত্র বিষয় করে আলোচ্য ও আঁকার অন্যান্য নিয়ম পালন করে অনুশীলন করে যেতে হয়ে পর পর কয়েকটি।

এক একটি ক্লাসের সময়- ৩ থেকে ৪ দিন। মাধ্যম- পেনসিল ও রঙিন প্যাস্টেল।

৩। প্রকৃতি থেকে ইচ্ছেমতো বিষয়- (কম্পোজিশন) ক্লাস- ৮টি

মাধ্যম- জলরং, পোস্টার রং, প্যাস্টেল রং বা ইচ্ছেমতো।

এক একটি ক্লাসের সময়- ৪ থেকে ৫ দিন-

প্রকৃতি থেকে বিষয় ঠিক করবে ছাত্ররা নিজের ইচ্ছেমতো। কোনো গ্রামের বাড়ি, নদীর ঘাট, নৌকা, মাছধরা, ধানকাটা ইত্যাদি। শহর হলে কোনো বসতি, রাস্তার দৃশ্য, গলির দৃশ্য, টিউটোরিয়াল দৃশ্য, শিশু পার্কের দৃশ্য ইত্যাদি বিষয় হতে পারে। গ্রামে ও শহরে অনেক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় সেগুলোও বিষয় হতে পারে। যেমন- যাত্রা, নাটক, কবিগানের গড়াই, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি। নিজের প্রিয় পশু-পাখিকে নিয়ে চিত্র রচনা হতে পারে। মানুষের বিভিন্ন জীবন ও পেশা নিয়ে বিষয় হতে পারে। যেমন রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, ফেরিওয়ালা, জেলে, কামার, কুমার এমনি অনেক কিছুকে বিষয় করে রং-রেখা, আলোছায়া, পরিপ্রেক্ষিতে ইত্যাদি নিয়মগুলো যথাসম্ভব ঠিক ঠিক তুলে ধরে একটি জমাট কম্পোজিশন বা চিত্র রচনা করতে হবে।

বর্ণমালা শেখা-

ক্লাসের সংখ্যা-৩টি (সম্ভব হলে আরও বেশি) প্রতিটি ক্লাসের সময়- ৩ দিন

- ১। ধরে ধরে বাংলা বর্ণমালা ও ইংরেজি বর্ণমালা সুন্দরভাবে লেখার জন্য কয়েকবার অনুশীলন ও অভ্যাস করতে হবে।
(প্রদর্শিত ছাপ হরফ থেকে)
- ২। হাতের লেখা বারবার লিখে অভ্যাস ও অনুশীলন করে সুন্দরভাবে লিখতে জানতে হবে।
- ৩। শিক্ষক একটি কবিতাংশ বা কোনো মহৎ সোকের বাণী সঙ্গ্রহ করে ছাত্রদের দেবেন। তারা কবিতাংশ সুন্দরভাবে লিখে ও নকশা করে চিত্রের রূপ দেবে। যেমন-
'মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা'
'মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই
সে মানুষ নহে।'

নকশা

ক্লাসের সংখ্যা-৩টি (সম্ভব হলে আরও বেশি), প্রতিটি ক্লাসের সময়- ৩ দিন।

- ১। বৃত্ত, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ ও রেখা দিয়ে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে নকশাচিত্র তৈরি করবে।

ক) নকশার মাপ- ৬" X ৬" সাপা-কাশো রং, কাগজের উপর- ৩টি ভিন্ন ভিন্ন নকশা।

খ) নকশার মাপ- ৮" X ৮" ২ রং বা ৩ রং- কাগজের উপর- ৩টি ভিন্ন ভিন্ন নকশা।

গ্রাফিক ডিজাইন

ক্লাসের সংখ্যা- ৩টি (প্রতিটি ক্লাস ২ দিন)

ক. স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন (যে কোনো মাধ্যম)।

খ. 'বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সজ্জকণ' এর উপর পোস্টার অঙ্কন (যে কোনো মাধ্যম)।

নমুনা প্রশ্ন (ব্যবহারিক)

- ১। প্রকৃতি থেকে যে কোনো বিষয়ে একটি স্কি হ্যান্ড ড্রাইং স্কেচ কর। কাগজের মাপ- ২৫ X ৩৭ সেমি।
মাধ্যম-পেনসিল বা কালি-কলম।
- ২। একটি বটগাছের গুঁড়ি পেনসিল মাধ্যমে অনুশীলন করে দেখাও। সময়- ৫ ঘণ্টা
- ৩। একটি কছুগাছ পেনসিলে অনুশীলন করে দেখাও। সময়- ৫ ঘণ্টা বা একদিন।
- ৪। একটি নৌকা পেনসিলে ধরে ধরে অনুশীলন করে দেখাও। সময়- ৫ ঘণ্টা বা একদিন।
- ৫। আমগাছের একটি ডাল, পাতাসহ কালি-কলমে স্ট্যাডি করে দেখাও। সময়- ৫ ঘণ্টা বা একদিন।
- ৬। তোমার সামনে মাটির পাত্র দিয়ে সাজানো স্থির বিষয়ের অনুশীলন- কাগজের মাপ- ২৫ X ৩৭ সেমি।
সময়- ২ দিন।
- ৭। রঙিন প্যান্টেল দিয়ে তোমার সামনে সাজানো স্থির বিষয়টি অনুশীলন করে আঁক। কাগজের মাপ- ২৫ X ৩৭ সেমি।
- ৮। জলরং বা পোস্টার রং দিয়ে নিচের যে কোনো বিষয়ে একটি চিত্র রচনা কর। কাগজের মাপ- ৩০ X ৪০ সেমি।
সময়- ৩ দিন।

বিষয়- নদীর ঘাট, জেলে, মোষের পিঠে রাখাল, খাঁড়ায় টিয়া পাখি, ধানকাটার দৃশ্য, কবি গানের লড়াই, বর্ণমালা ও নকশা।

দশম শ্রেণির জন্য ব্যবহারিক শিল্প, ছবি আঁকা বর্ণমালা শেখা, নকশা, ফ্যাশন ডিজাইন ও ইন্টেরিয়র ডিজাইন

ছবি আঁকা

- ১। বাস্তব জীবন ও প্রকৃতি থেকে স্কেচ ও ড্রাইং ক্লাসের সংখ্যা- ৫টি।

মাধ্যম-পেনসিল, কালি-কলম ও ক্রেয়ন।

উপরের মাধ্যমগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা নবম শ্রেণির মতো জীবজন্তু ও মানুষকে বিষয় করে আঁকার চেষ্টা করবে। সেজন্য শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে চিড়িয়াখানা, বাস্তু মানুষের স্থান, হাটবাজার, রেলওয়ে স্টেশন, গ্রামে-যেখানে গল্প, মোব বেলি পাওয়া যায় ইত্যাদি স্থানে নিয়ে যাবেন।

উপরের মাধ্যমগুলোতে এবং সম্ভব হলে জলরঙে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো যথাসম্ভব মেনে অর্থাৎ আলোছায়া, পারসপেকটিভ ইত্যাদি ঠিক রেখে যত বেশি পারা যায় অনুশীলন করতে হবে। যেমন- বিভিন্ন রকম গাছপালা, পলু-পাখি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য।

আর স্কেচ বই বা খাতায় সব সময় স্কেচ ও ড্রাইং অবশ্যই করে যেতে হবে। স্কেচ বই হবে সব সময়ের সঙ্গী।

২। **শিরচিহ্ন/ স্টিল লাইফ ক্লাস ৫টি; সঙ্কব হশে আরও বেশি।** প্রতিটি ক্লাসের সময়- ৩ থেকে ৪ দিন।

শিক্ষক ক্লাসে শিরচিহ্নের বিষয় সাজিয়ে দেবেন। শিরচিহ্নের বিষয় নবম শ্রেণির মতো ইড়ি-পাতিল, বোতল, বৈয়াম, এসব দিয়েও সাজাতে পারেন। নতুন বিষয় ফলমূল, কলা, পেঁপে এবং তরিতরকারি-লাউ কুমড়া, বেগুন ইত্যাদি দিয়েও সাজাতে পারেন। শিরচিহ্ন সাজাবার সময় লক্ষ রাখতে হবে যে আলোছায়ার প্রতিফলন যেন ঠিকমতো হয়। দশম শ্রেণিতে আগের মতো পেনসিলে ২/১ টি ক্লাস করে পরের ক্লাসগুলো অবশ্যই জলরং মাধ্যমে করবে।

৩। **চিত্র রচনা বা কম্পোজিশন ক্লাস ৫টি, সময়- ৫ দিন।**

শিক্ষক, কীভাবে চিত্র রচনা করতে হয় তা ছাত্রদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবেন। বইতে চতুর্থ অধ্যায়ে কম্পোজিশন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। ছাত্ররা যে বিষয়ে চিত্র রচনা করবে সেটি আগে কিছু ছোট আকারে খসড়া করে নেবে। অন্ততঃ ৩/৪টি খসড়া থেকে সবচেয়ে সুন্দরটি শিক্ষক বেছে দেবেন। সেটি জলরঙে, পোস্টার রঙে বা প্যাঁস্টেলে শিকারীর ইচ্ছেমতো যে কোনো রঙে আঁকবে। বিষয় গ্রহণ করবে প্রকৃতি থেকে ও জীবনযাপন থেকে। নবম শ্রেণিতে সেই বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে।

বর্ণমালা পেখা- ক্লাসের সংখ্যা- ৩টি, সময়- প্রতিটি ক্লাস-৩দিন। নবম শ্রেণি থেকে বর্ণমালা পেখার চর্চা করবে। হাতের লেখা চর্চা করে আরও সুন্দর করবে। কয়েকটি ক্লাস করবে নিচের বিষয়গুলো চর্চা করার জন্য।

(ক) মানপত্র তৈরি, (খ) পোস্টারচিত্র তৈরি, (গ) অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপি তৈরি, (ঘ) শুভেচ্ছাপত্র তৈরি। নববর্ষের কার্ড, দীপ কার্ড, জন্মদিনের কার্ড ইত্যাদি।

নকশা

ক্লাসের সংখ্যা ৩টি- প্রতিটি ক্লাস- ৩ দিন

(ক) বৃন্ত, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ, রেখা ও ফুল-পাতা সমন্বয়ে ইসলামিক ডিজাইন তৈরি করবে। শিক্ষক নকশা তৈরির বিষয়টি বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

(খ) ছাত্ররা নিজেরা ভেবে-চিন্তে কিছু নকশা তৈরি করবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য। যেমন- চাদর, পর্দা, ছোটদের জামা-কাপড়, পাঞ্জাবি, শাড়ি, সোফা, কুশন, টেবিল কাপড় ইত্যাদি।

ফ্যাশন ডিজাইন (Fashion design)

ক্লাসের সংখ্যা- ২টি (প্রতিটি ক্লাস ২ দিন)

শিক্ষার্থী নিজেদের বা পরিবারের জন্য দুটি পোশাকের নকশা অঙ্কন করবে।

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা (Interior Decoration)

ক্লাসের সংখ্যা ২টি, প্রতিটি ক্লাস-২দিন। কসার কক্ষ ও শয়ন কক্ষের দুটি করে নকশা অঙ্কন। একেবারে ব্যবহৃত আসবাব ও পর্দা এবং দেয়ালের রং একে দেখাবে।

নমুনা প্রশ্ন (ব্যবহারিক)

- ১। সামনে বাঁধা গছটির বিভিন্ন সিক থেকে কয়েকটি ফ্রি হ্যান্ড ড্রইং ও স্কেচ কর। সময় - ১ দিন।
- ২। প্রকৃতি থেকে তোমার ইচ্ছেমতো ১টি ড্রইং ও স্কেচ করে দেখাও। সময় - ১ দিন।
- ৩। একটি আমগাছ বা বাঁশ ঝাড় পেনসিলে বা কালি-কলামে অনুশীলন করে দেখাও।
- ৪। একটি কুঁড়ের ও তার পরিবেশ পেনসিল বা কালি-কলামে অনুশীলন করে দেখাও। কাগজের মাপ- ২৫ X ৩৭ সেমি., সময়-১ দিন।
- ৫। তোমার সামনে সাজানো শির জীবন চিত্রটি জলরং দিয়ে আঁক। সময়- ৩ দিন।
- ৬। সবজি দিয়ে সাজানো শির জীবন চিত্রটি প্যাস্টেল রঙে বা জলরঙে আলোছায়ার প্রতিফলনসহ আঁক। কাগজের মাপ- ২৫ X ৩৭ সেমি., সময়- ৩ দিন।
- ৭। জলরং বা পোস্টার রঙে নিচের যে কোনো একটি বিষয়ে চিত্র রচনা কর। মূল চিত্রের সাথে চিত্র রচনার খসড়াগুলো জমা দিতে হবে। কাগজের মাপ- ৩০ X ৪০ সেমি. বা ১৫" X ১৮", সময়- ৫ দিন। বিষয়- জেলে, তাঁতি, গরুরগাড়ি, কলসি ঝাঁখে বধু, পাখি বিক্রেতা, বেদে, পালতোলা নৌকা, নৌকাবাইচ, ধান কাটা, ধান মাড়াই, ফেরিওয়ালা, যে কোনো মেলা, ধান ভানা, পিঠা বানানো, একুশের প্রগাথফেরি, মিছিল, মেলা ও ঈদ। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো বিষয় ঠিক করে তা দিয়ে চিত্র রচনা পরীক্ষা দিতে পারে। শিক্ষক সেভাবে প্রশ্ন করতে পারেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়
বাস্তব ও স্রুতি থেকে অনুশীলন



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- স্কিন হাইক বা শির জীবন নিয়ে ছবি আঁকতে পারব।
- মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আঁকতে পারব।
- প্রকৃতি ও পারিবারিক জগৎ নিয়ে ছবি আঁকতে পারব।
- স্রুতি থেকে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়ভিত্তিক ছবি আঁকতে পারব।
- টাইলস দিয়ে মোজাইক শেইপিং করতে পারব।

পাঠ : ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬

স্টিল লাইফ ও শিল্পকলা (অঙ্কন জীবন)

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার্য নানা প্রকারের বস্তু বা জিনিসের এককভাবে অনুশীলন করেছি। এখন আমরা কতগুলো বস্তু বা জিনিসকে একত্রে সাজালেও যে এটি একটি অলাদা বিষয় হয়ে শিল্পগুণে প্রকাশিত বা উপস্থাপিত হতে পারে তা জানব।

শিল্পচিত্র অঙ্কনে যে বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন তা হলো বিষয়বস্তুর আকার আকৃতির সুসমন্ভব বিষয় নির্বাচন, বিষয় সাজানো সর্বোপরি আলোর দিক নির্দেশনা লক্ষ করে বাস্তবভাবে কীভাবে অঙ্কন করা যায় তা শিক্ষকের সাহায্যে এবং নিম্নের চিত্র থেকে ধারণা নিয়ে তোমরাও মনেরমতো বিষয় নির্বাচন করে অনুশীলন করতে পারবে।



গোষ্ঠার রঙে আঁকা স্টিল লাইফ বা শিল্পচিত্র

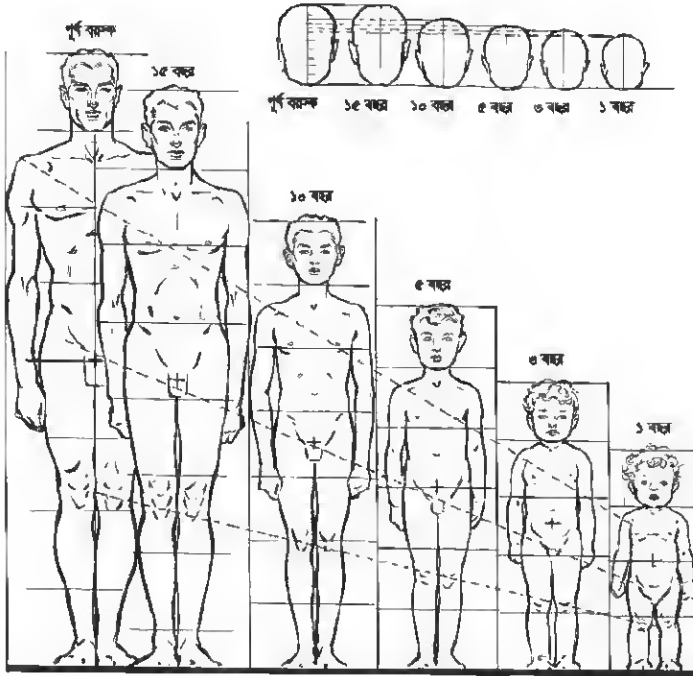
পাঠ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২

মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আঁকার অনুশীলন

অষ্টম শ্রেণিতে মানুষ ও প্রাণী আঁকার প্রাথমিক অনুশীলন আমরা জেনেছি। এখন আমরা জানব মানুষ আঁকার কিছু কাঠামোপত কৌশল। ছোট শিশু থেকে পূর্ণবয়স্ক একটি মানুষের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কতগুলো মাণিক্যকের নিয়ম আছে। বয়স ভেদে মানুষের দেহ অবকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। একটি শিশুর ছবি আঁকার পরিমাণকের সাথে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ছবি আঁকার পরিমাণকের তুলনা রয়েছে। যেমন— একটি ছোট শিশুর ছবি আঁকার সময় যদি তার মাথার মাণিকে

একক করে নেই তাহলে তার সমস্ত শরীর যেমন ৪টি মাশে বিভাজন করা যাবে, তেমনি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে কিছু সেটা হবে না। তার মাথার মাপ একক করে বিভাজন করলে তা ৭ কিংবা ৮ গুণে ভাগ করা যাবে।

নিম্নের চিত্রে একটা ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হলো।



বিভিন্ন বয়সে মানুষের গৈরিম পরিবর্তন

শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে তোমরা অনুশীলন করলে এ বিষয়ে আরও দক্ষতা নিজেসাই অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া মানুষের গতি-প্রকৃতির ওপর একটু পঠীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয় করে তোমরা তোমাদের অধিকতর ছবিতে মানুষের সাথে কোনো প্রাণীর ছবি সংযোজন করে আরও গ্রাণবস্ত্র করে ফুলতে পারবে।

পাঠ : ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯

প্রকৃতি থেকে অনুশীলন

আমরা প্রতিদিন সৃষ্টিনিষ্ঠর ছবি ঐকেছি। এখন আমরা বাস্তবের একটা ছবি কীভাবে আঁকা যাবে, সে বিষয়ে জানব। আমরা যে যেখানেই গুঁড়ি কান তর চারপাশে প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে। তোমার পারিশ্রমিকতার যে দু'টি তোমার বেশি ভালো লাগে— কোনো এক ছুটির দিনে সেখানে কাগজ, বোর্ড, পেনসিল নিয়ে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে বলে ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মের আলোকে এবং শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে কাজ শুরু করে দিবে। এখানে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পিত্ত হবে তা হলো তেমন কাগজে বা ক্যানভাসে তোমার নির্বাচিত বিষয়ের কোন অংশটুকু আঁকবে তা মনে মনে তেবে দিবে। অল্পও একটি বিষয়ের দিক খোলা রাখতে হবে তা হলো— তুমি যে সময় ছবিটি আঁকবে সেই সময়ের আলোর নির্দেশনা, যেমন— তুমি যদি সকাল নয়টার ছবিটি আঁক তাহলে সূর্যের আলো পূর্ব দিকে থাকবে পশ্চিম দিকে ছায়া পড়বে। আবার ব্যঙ্গোটার পর দুইটা কিংবা তিনটার সময় যদি তুমি ছবিটি আঁক তাহলে আলো পশ্চিম দিক থেকে আসবে এবং পূর্ব দিকে ছায়া পড়বে। প্রকৃতির সাথে আলোছায়ার যে নিবিড় সম্পর্ক তা জেনে তুমি যখন ছবি আঁকবে তখন তোমার ছবিই বলে দিবে এটা কোন সময়ে ঐকেছ। প্রাকৃতিক দৃশ্য বা যে কোনো ছবি আঁকার সময় এ ব্যাপারটি মনে রাখতে হবে।



পেনসিলে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য

পাঠ: ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫

স্মৃতি থেকে অনুশীলন

আজকে বা কিছু আমরা বাস্তবে অবলোকন করি আগামীকাল তা হয়ে যায় স্মৃতি। আমাদের জীবনে অনেক ঘটনা আছে যা স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। কোনো কোনো স্মৃতি থাকে মধুর আবার অনেক স্মৃতি থাকে বেদনার। সে সব স্মৃতিনির্ভর ছবি আঁকতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হয় সেই সময়ে। চোখ বুজলেই দৃশ্যকল্পে ভেসে ওঠে ঘটনার ছবিস্বপ্ন বর্ণনা। একটু গভীরভাবে উপলব্ধি করে আমরা সে সব ঘটনার বর্ণনা দিয়েও ছবি আঁকতে পারি। যেমন— বার্ষিক পরীক্ষার পর বিদ্যালয় থেকে তোমাদের শ্রেণির সব কক্ষুরা শিক্ষকদের নিয়ে দূরে কোনো মনোরম পরিবেশে শিক্ষা সফরে গেলে। সেখানকার প্রকৃতি, পরিবেশ, দর্শনীয় স্থানগুলো সকলে মিলে উপভোগ করেছ। যা এখন তোমার মনের মাঝে গেঁথে আছে। গভীরভাবে ইচ্ছা করলে তুমি সে স্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে একটা মজার ছবি একে ফেলতে পার। তেমনিভাবে তোমার স্মৃতিবিজরিত যে কোনো ঘটনা নিয়েও ছবি আঁকতে পার।

পাঠ : ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০

মোজাইক পেইন্টিং (Mosaic Painting)/ দেওয়ালচিত্র বা মুরাল (Mural)

মুরাল শিল্প হিসেবে অত্যন্ত প্রাচীন। সাধারণত পাবলিক স্পেস বা জন সমাগম হয় এ রকম স্থানে, কোনো ভবন বা দেয়ালে বড় আকারের যে ছবি করা হয়, তাকে মুরাল বলে। বড় বড় ছোট্টে, রেসেতারী, অফিস ভবন, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাতে মুরাল হয়ে থাকে। গ্রেজ টাইলস এ নির্মিত হয় বলে রোদ, বৃষ্টি, কড়, ধূলা-বালি ও অন্যান্য প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে মুরাল টিকে থাকতে পারে। সে জন্য খোলা জায়গায় বা ভবনের বাইরের দেয়ালে মুরাল নির্মাণ করা হয়। মুরালকে মোজাইক চিত্র বা Mosaic Paintingও বলা হয়।

নানা রঙের গ্রেজ টাইলস দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়। আমরা দেয়ালে লাগানোর জন্য যে সব টাইলস ব্যবহার করি চিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রং নির্বাচন করে সে সব টাইলস দিয়েই মোজাইক চিত্র বা মুরাল নির্মাণ করা যায়। তবে ছোট ছোট রঙিন পাথরের টাইলস এর এবং কাচের টুকরা বা নানা ধরনের সিরামিক পাত্রের ভাঙা টুকরা দিয়েও মোজাইক চিত্র করা সম্ভব।



রঙিন টাইলস ভেঙে মোজাইক ছবি

নির্মাণ পদ্ধতি

মুরালগের জন্য প্রথমে নির্ধারিত ছবির ছোট শে-আউটকে প্রয়োজন অনুযায়ী বড় করে নিতে হবে। অর্থাৎ ছোট আকারের ছবিটিকে যে জায়গায় মুরাল তৈরি হবে সে জায়গার যাপ অনুযায়ী আনুগাতিক হারে বড় করে নিতে হবে। নকশা বা ছবিটি মাপমতো কাগজে বা রেক্সিন পেপারে রং দিয়ে ঐক্রে নিতে হবে। পরে ঐ কাগজ বা রেক্সিন (আজকাল ছোট ছবি বা শে-আউটকে ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মাপে বড় করা হয়) মেঝেতে বিছিয়ে নিতে হবে। এবার নকশা বা ছবির রং অনুযায়ী রঙিন টাইলস এর ছোট ছোট টুকরা উটেপিঠি নিচে এবং রঙিন পিষ্ট উপরে রেখে ছবির ওপর বসিয়ে দিতে হবে। পুরো ছবিতে রঙিন টুকরা টাইলস সাজিয়ে দিলে কাগজে রেক্সিনে অঙ্কিত ছবি অনুযায়ী রঙিন মুরালচিত্র সম্পন্ন হবে। এরপর ভালোভাবে ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে উপরের খুলা-বাঁলি ও অন্যান্য ময়লা বাতাস দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর একটু মোটা কাগজে ময়দার আঠা মেখে সাবধানে সেই কাগজ সাজানো টাইলসের ওপর বসিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। অঠা শুকানোর পর ছোট ছোট অংশে ছবিটিকে ভাগ করে দাগ দিয়ে নিতে হবে। ভাগগুলোর ক্রম বা সিরিয়াল যাতে ঠিক থাকে সে জন্য এতে নম্বর বা চিহ্ন দিতে হবে। তারপর দাগ অনুযায়ী কাগজসহ ছবিটিকে ছোট ছোট টুকরা অংশে কেটে নিতে হবে। সুন্দরভাবে প্যাকেট করে যে স্থানে বা দেয়ালে মুরাল তৈরি হবে, সেখানে দিয়ে যেতে হবে তারপর দেয়ালে সিমেন্টের অলতর দিয়ে তার ওপর ঘ্রাব বা কাটা অংশগুলো পূর্বের ক্রম অনুযায়ী বসিয়ে দিতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে যাতে কাগজের দিকটা ওপরে থাকে। সমস্ত অংশ সিমেন্ট লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শুকানোর পর পানি দিয়ে কাগজ ভিজিয়ে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ কাগজ ভুলে ফেলতে হবে, তা হলেই প্রয়োজনীয় মুরালচিত্রটি পাওয়া যাবে। কাগজ তোলা শেষ হলে ছবিটি ভালোভাবে পানি ও গুঁড়া সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে সাদা সিমেন্টের সাথে রঙিন অক্সাইড মিশিয়ে পুটিং করা যেতে পারে।

নমুনা প্রশ্ন

ব্যবহারিক

১. স্থিরচিত্র (still life) অঙ্কনের কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি বেশি মনে রাখা প্রয়োজন।
২. বাস্তব ছবি অঙ্কনের সময় যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা তোমার আউটডোরের একটি ছবি আঁকার মাধ্যমে বর্ণনা কর।
৩. বয়স ভেদে মানুষের দৈহিক আকার-আকৃতির পরিমাপের যে তিন্তা তা অঙ্কনের মাধ্যমে তুলে ধর।
৪. মোজাইক পেইন্টিং (Mosaic Painting) নির্মাণের কৌশলগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায় কারুকলা

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

বাঁশ ও বেতের কাজ

- বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব। যেমন— পুতুল, ফুলদানি, ছাইদানি, কলমদানি ইত্যাদি। বাঁশের চালান, বুড়ি, খালই, বাঁশের চাটাই ইত্যাদি তৈরি করতে পারব।
- বেতের সাধারণ পাটি ও নকশি পাটি তৈরি করতে পারব।
- ছোট ছোট ঝালই, বুড়ি তৈরি করে ঘর সাজাতে পারব।

কাপড় ছাপা

- রঙের নামগুলো জানব।
- কাপড়কে রংকরণ ও ছাপার জন্য উপযোগী করে তৈরি করতে পারব।
- কাপড় রং করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- ব্লক তৈরি করতে পারব, ব্লক দিয়ে কাপড়ে ছাপ দিতে পারব।
- টাইডাই পদ্ধতিতে কাপড় ছাপার কাজ করতে পারব।
- মোম বাটিক পদ্ধতিতে কাপড় ছাপতে পারব।
- কাঠ কেটে বিভিন্ন শিল্পকর্ম করতে পারব।

ফেশনা স্টিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

- ভাস্কর্য ইড়ি—পাতিল দিয়ে বিভিন্ন রকম শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব।
- ফেশনা ভার দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব।
- এই শিল্পকর্ম দিয়ে নিজের ঘর সাজাতে পারব।
- মাটির চ্যাব দিয়ে শিল্পকর্ম (টেরাকোটা) তৈরি করতে পারব।

পাঠ : ১

বাঁশ ও বেতের কাজ

বাঁশ আমরা সবাই দেখেছি। আমাদের দেশে নানা প্রকার বাঁশ পাওয়া যায়। যেমন—বরাক, মাখাল, জাই, মুদি, চিকন প্রভৃতি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একই বাঁশ হয়তো ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন— বরাক সিঙ্গেটে বরুয়া এবং নোয়াখালীতে বরুয়া নামেও পরিচিত। মাখাল বাঁশকে কোথাও বাকাল আবার মুদিকে কোথাও বা বেতো বাঁশ বলা হয়।

বেত আমাদের কাছে পরিচিত। মোটা ও সরু, সাধারণত দুই ধরনের বেত সচরাচর আমরা দেখে থাকি। মোটা লম্বা বেত, গোছা বেত এবং চিকন বেত ছালি—বেত নামে পরিচিত। এই বাঁশ ও বেত দিয়ে ঘর—দরজা, চেয়ার—টেবিল, আলনা, দোলনা, ডালা, কুলো, খেগনা এবং আরো কত সুন্দর জিনিস যে তৈরি করা যায় তা বলে শেষ করা যায় না।

কিন্তু সব বাঁশ দিয়ে সব কাজ হয় না। সব বেত দিয়েও না। যে কাজের জন্য যে বাঁশ সবচেয়ে বেশি উপযোগী সে কাজে সে বাঁশ ব্যবহার করতে হয়। বেতের বেলায়ও তাই—কাঠামোর জন্য ব্যবহার করতে হয় গোছা বেত আর বাঁধন নকশা ও বুনন এর জন্য ছালি বেত। এ হলো সাধারণ নিয়ম। তাই কোনো জিনিস তৈরি করতে গেলে ঐ কাজের উপযোগী প্রয়োজনীয় বাঁশ—বেত সঙ্গ্রহ করে নেব। কিন্তু সব সময়ই তো আর ইচ্ছেমতো সব জিনিস পাওয়া যায় না। হাতের কাছে যখন যে জিনিস পাব তা দিয়েই সবক'ইতে কম খাটুনিতে সব চেয়ে সুন্দর কী জিনিস তৈরি করা যায় তা চিন্তা করব। একঝড় বাঁশ পেলে সেটা ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখব ও চিন্তা করব এ দিয়ে কী তৈরি করা যায়। ফুলদানি, ট্র, ডালা, কুলো, বুড়ি, নৌকা, পুতুল, বাঁশি না অন্য কোনো কিছু?

উপকরণ

কোনো জিনিস তৈরি করতে গেলে বাঁশ, বেত ছাড়াও যন্ত্রপাতি ও আরো কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়। যেমন— ধারালো দা, ছুরি, করাচ, হাতুড়ি, বাটল, ভরপুন, শিরীষ কাগজ ভাস্ক্রা কাচের টুকরা, ছোট বড় ভারকাটা এবং বাঁশ বেত ও কাঠ জোড়া দেওয়ার উপযোগী শক্ত আঠা ইত্যাদি। যারা আমরা শহরে বাস করি সহজেই পেঁগিগাম, আইকা, অ্যাক্সেলিক এসব উন্নতমানের বিশেষ তৈরি আঠা সংগ্রহ করে নিতে পারি। কিন্তু মফস্বলের জন্তাছাত্রীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই সহজলভ্য ও বেশ শক্ত আঠা তৈরির একটি পদ্ধতি এখানে ছেনে নিই।

ময়দার সাথে পানি মিশিয়ে বৃষ্টি তৈরির উপযোগী একটি পিঁড় বা গোলা তৈরি করি। এক টুকরা পাতলা কাপড় ঐ পিঁড়টি ভালো করে বেঁধে নিয়ে গামলায় পানিতে, হাতের মুঠোর চেপে চেপে ধুতে থাকি। গামলার পানি মাঝে মাঝে বদলাব এবং যতক্ষণ ঐ পিঁড় থেকে ময়দা ধোয়ার সাপা পানি বের হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধোবো। ধোয়া শেষ হলে দেখব কাপড়ের বাঁধনে ছানার মতো নরম কিছু জিনিস জমে আছে। একটি পায়ে তা যত্ন করে তুলে রাখি। এর সাপে সামান্য কিছু পানি খাওয়ার চুন খুব ভালো করে মেশাচ্ছে খুব ভালো আঠা তৈরি হবে। চুন মেশানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই আঠা ব্যবহার করতে হবে তা না হলে শক্ত হয়ে যাবে। চুন না মেশালে ছানার মতো অবস্থায় এই আঠা দুদিন পর্যন্ত রাখা যায়। বাঁশ ও বেত দিয়ে কেমন করে কী জিনিস তৈরি করা যায় এবার ছেনে নিই।

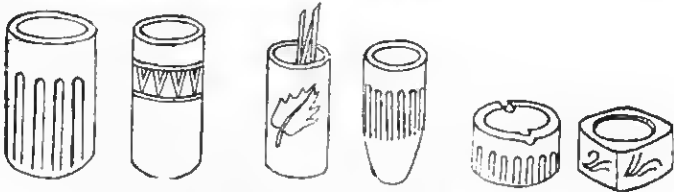
পাঠ : ২ ও ৩

ফুলদানি

বাঁশ দিয়ে খুব সহজে ফুলদানি তৈরি করা যায়। ফুলদানির জন্য মোটা ফাঁপা বরাক বাঁশের প্রয়োজন। বাঁশ যেন পাকা ও

শুকনো হয়। লক্ষ রাখব বাঁশের গায়ে যেন কোনো ফাটল না থাকে, পোকায় কাটা না হয়। বাঁশের গিটগুলো ধরাশালা দা দিয়ে ঠেঁহে সমান করে নেব যেন হাতে না লাগে। করাত দিয়ে খুব সাবধানে গিটের এক বা দেড় ইঞ্চি নিচে কেটে নেব। লক্ষ রাখব যেন গিট কেটে ছিদ্র না হবে যায়। বাঁশ যেমন মোটা তার সাথে মিশ রেখে ফুলদানির উচ্চতা ঠিক করতে হবে। বাঁশের ব্যাস মেপে নিয়ে তার ঘিণ্ণ উচ্চতা রাখলে মানানসই হয়। ভালো লাগলে এর চেরে লম্বা করেও কাটেতে পারি। উচ্চতা ঠিক করে খুব সাবধানে করাত দিয়ে কেটে নিই। খেয়াল রাখব কাটার সময় যেন ফেটে না যায়। এই তো মোটামুটিভাবে একটা ফুলদানি তৈরি হলো। শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘবে ফুলদানির মুখ ও তলা মসৃণ করে নিই। এবার এটাকে কত বেশি সুন্দর করা যায় তা ভেবে চিহ্নিত করতে হবে। বাঁশের উপরের মসৃণ অংশ ঠেঁহে তুলে নিলে ভেতর থেকে লম্বালম্বি আশের সুন্দর স্তর বের হয়। স্বাভাবিক মসৃণ অংশ ও চাঁচা অংশের মধ্যে রঙেরও তারতম্য হয়। এই তারতম্যকে ফুলদানির গায়ে নকশা করার কাজে লাগানো যায়। চাঁচা অংশ অবশ্যই শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘবে মসৃণ করে নেব। এভাবে পছন্দমতো নকশা করার পর ফুলদানির ভিতরে ও বাইরে কোপাল ভার্মিশের চকচকে প্রলেপ দিয়ে নেব। অন্যান্য পদ্ধতিতেও নকশা করা যায়। বাঁশের স্বাভাবিক মসৃণ পিঠ সম্পূর্ণরূপে ঠেঁহে তুলে ফেলে শিরীষ কাগজে ঘবে পলিশ করে নিয়ে এনামেল বা অন্য কোনো রং দিয়ে পছন্দমতো নকশা করব। ঐ রং শুকিয়ে যাওয়ার পর ফুলদানির ভিতরে ও বাইরে কোপাল ভার্মিশের প্রলেপ দিয়ে নেব। ভার্মিশে জিনিসটি যেমন চকচকে হয় তেমনি পোকায় কাটারও ভয় থাকে না।

উপরে দেয়া একই নিয়মে পেনসিল ও কলম রাখার পাত্র, ছাইদানি, গ্লাস ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। ছাইদানির উচ্চতা পরিমানমতো কমিয়ে নেব, গ্লাসের মুখ ভেতর থেকে ঠেঁহে গাতলা করতে হবে আর নিচের দিকটা ঠেঁহে সরু করে নিলে সুন্দর দেখাবে। পেনসিল ও কলম রাখার পাত্র এবং গ্লাসের জন্য অপেক্ষাকৃত সরু গাতলা বাঁশ ব্যবহার করব। মুলি বা বেতো বাঁশের গোড়ার দিকটা এ কাজের জন্য উপযোগী। ছাইদানির জন্য মোটা ও পুরু বাঁশের প্রয়োজন। নিচের ছবিতে ফুলদানি, পেনসিল ও কলম রাখার পাত্র, গ্লাস ছাইদানি প্রভৃতির কিছু নমুনা আছে। এমনি করে বাঁশ কেটে ও ছেঁটে আরো বিভিন্ন নকশায় ঘেলে বিভিন্ন গড়ন ও গঠনের জিনিস তৈরি করতে পারি।



বাঁশের তৈরি নানা রকম ফুলদানি, কলমদানি, ছাইদানি

উপরে আলোচিত জিনিসগুলো তৈরি করতে বাঁশ চেরা অবশ্য ছিয়ার প্রয়োজন হয় না। শুধু কেটে নিশেই হলো। এবার যে সব জিনিসের কথা জানব, সেগুলো তৈরি করতে হলে বাঁশ চেরা ও ছিয়ার প্রয়োজন হবে। তাই আগেই এ সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। বাঁশকে চিরে ও ছিলে ব্যবহারের উপযোগী ও আকৃতির প্রকারভেদে মোটামুটিভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— চটা, শলা, বেতি ও পাতি।

পাঠ : ৪, ৫ ও ৬

চটা : বাঁশের লম্বাশাশ্বিভাবে চিরে গেঁছে কিছুটা মসৃণ করে নিম্নেই বাঁশের চটা তৈরি হয়। শলা সাধারণত দেখতে গোল এবং লম্বা। প্রয়োজনবোধে শলা খুবই সরু করা যায়। প্রয়োজনমতো লম্বা-শম্ভি করা যায়, তবে দুই তিন হাতের বেশি নয়। শলা তৈরির জন্য মাথাল বা বাকল বাঁশের প্রয়োজন। বান্ধকট, মাছ ধরার সরঞ্জাম, দোশনা প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে শলা ব্যবহার করা হয়।

বেতি : মূলি বা বেতো বাঁশ দিয়ে বেতি তৈরি করতে হয়। প্রথমত চটা তৈরি করে বুকের দিকটা ভালো করে গেঁছে ফেলে দিয়ে বেতি সরু করে চিরে ও ছিলে কিছুটা মসৃণ করে নিতে হয়। বেতি সাধারণত চারকোণ বিশিষ্ট, চওড়া ও সরু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতি পুরুর চেয়ে চওড়া কিছুটা বেশি হয়। টুকরি, খালই, মাছ ধরার সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈরি করতে বেতির প্রয়োজন।

পাতি : পাতি তৈরির জন্য মূলি বা বেতো বাঁশের একান্ত প্রয়োজন। বাঁশের পিঠ ও বুকের মাঝামাঝি অংশটুকু খুব সাবধানে পরতের পর পরত ছিলে নিয়ে পাতি তৈরি করতে হয়। কাঁচা বাঁশ থেকে পাতি ছিলা সহজ, তবে কোনো কিছু বোনর আগে ঐ পাতি ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো বাঁশ দিয়ে পাতি তৈরি করা খুবই কঠিন। পাতি ছিলায় আগে শুকনো বাঁশ দুই তিন দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখব। পাতির আকৃতি চ্যাটা এবং পাতলা, এক সূতা থেকে ইঞ্চি খানেক চওড়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লম্বা। সুস্থ ও খুব পাতলা পাতি এক হাত দেড় হাতের বেশি লম্বা রাখা যায় না। কুলো, ডালা, চালনি, পাখা ও অন্যান্য জিনিস বুনন এর কাজে পাতি ব্যবহার হয়।

বাঁশের চটা দিয়ে আমরা নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় ও সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারি। যেমন— কাগজ কাটার ছুরি, খাওয়ার টেবিলের ছুরি, চামচ, কাটা ইত্যাদি। বাঁশের চটা দিয়ে নৌকাও তৈরি করতে পারি।



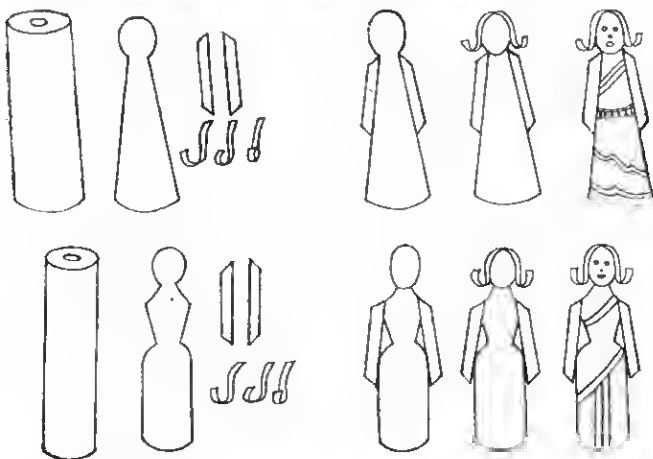
কাগজ কাটার ছুরি

এ দুটি জিনিস তৈরি করার একই নিয়ম। এগুলোর আকৃতিতে শুধু সামান্য ব্যবধান। ইঞ্চি খানেক চওড়া ও আট/নয় ইঞ্চি লম্বা পাকা বাঁশের চটা নিই। বুকের দিকের নরম অংশটা ফেলে দিয়ে গেঁছে প্রয়োজনমতো পাতলা করি। পিঠেরদিকটাও সামান্য গেঁছে নিই যাতে বাঁশের বাঁশ দেখা যায়। ছুরির বাটের দিকটা যেন অশেষ্কাকৃত পুরু থাকে। খুব সাবধানে ধিরে ধিরে ছবির আকৃতির অনুকরণে কাটি। কাগজ কাটার ছুরির দুদিক এবং খাবার টেবিলের ছুরির আরেক দিক ধারালো করে নিই। এবার ভালো কাচের টুকরা দিয়ে একটু গেঁছে খুব মিহি শিলীষ কাগজ দিয়ে ঘষে খুব মসৃণ করি এবং কোশাল ভাষিশের প্রলেপ দেই।

পুতুল

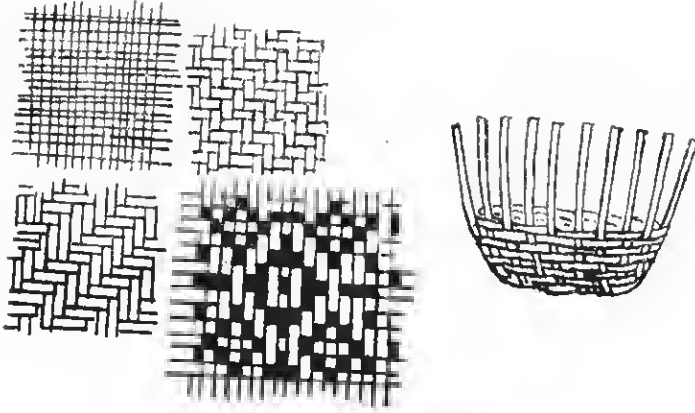
বাঁশ দিয়ে সুন্দর সুন্দর পুতুলও তৈরি করা যায়। পুতুলের জন্য এক ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের পুরু বাঁশের প্রয়োজন। ভিতরের ছিদ্র যেন খুব ছোট হয়। চিকন বাঁশের গোড়ার দিকটাই উপযোগী। বাঁশের বাস যত বেশি হবে

পুতুলের উচ্চতা তত বাড়বে। নিচের ছবিতে দুই ধরনের পুতুল তৈরির বিভিন্ন স্তর পর পর দেখে নিই। ছবি দেখি এবং সে অনুযায়ী পুতুল দুটি তৈরি করি। মাথার চুলের জন্য খুব মসৃণ ও পাতলা করে বাঁশের পাতি ছিলে নিই। পাতিগুলোর মাথা পেনসিল অথবা আরো সরু কোনো কিছুতে পৈঁচিয়ে পাতি দিয়ে ছিলে নিই। পাতিগুলোর মাথা পেনসিল অথবা আরো সরু কোনো কিছুতে পৈঁচিয়ে আগুনের ঝাঁচ দিলেই সব সময় বাক্য থাকবে। পুতুলের হাতগুলো বাঁশের কাটি দিয়ে তৈরি করি। পুতুলের চুল ও হাত আঠা দিয়ে লাগাব। চুল লাগানোর আগেই মিহি শিরীষ কাপড়ে ঘষে পুতুলটি মসৃণ করে নিই। চুল লাগানোর পর ভারিশের প্রলেপ দেব। ভারিশ পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে এনামেল রং দিয়ে হলকা করে চোখ, মুখ আঁকব, নাকের চিহ্ন দেব এবং কাপড়-চোপড় বুঝাবার জন্য ছবি আঁকব, নকশা করব ও মাথার চুলগুলো কাশো করে দেব।



বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন রকমের তৈরি পুতুল

নানা রকম শব্দের জিনিস ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাঁশ বেতের জিনিসের ব্যবহার খুবই বেশি। ডালা, কুশো, চালনি, টুকরি, খালই, মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম ছাড়া আমাদের কৃষি নির্ভর সমাজে অচল। উপরোক্ত জিনিসগুলো তৈরি করার জন্য প্রথমে বুনন শেখা প্রয়োজন। বহু ধরনের বুনন আছে, বুনে বুনো সুন্দর সুন্দর নকশাও তোলা যায়। সাধারণত একধারা, দুধারা ও তেধারা বুননের প্রচলন খুব বেশি। সমতলভাবে যেমন বোনা যায় তেমনি কুণ্ডলি পাকিয়ে ক্রমপত বুনো নিচ থেকে উপরে ওঠা যায়। প্রয়োজনবোধে ওপর থেকে নিচেও নামা যায়। কুণ্ডলি পাকানো বুনাও একধারা, দুধারা ও তেধারা পদ্ধতি প্রচলিত। হাতপাখা কিংবা কোনো সৌখিন জিনিসের মধ্যে বুনো নকশা তোলার জন্য রঙিন পাতি ব্যবহার করা হয় এবং নকশার প্রয়োজনে একধারা, দুধারা, তেধারা প্রভৃতি বুননের সমন্বয় করা যায়। ছবিতে পর পর একধারা, দুধারা, তেধারা কুণ্ডলি পাকানো ও নকশা বুননের নমুনা দেখে নিই। এবার নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস তৈরির পদ্ধতি জেনে নিই।

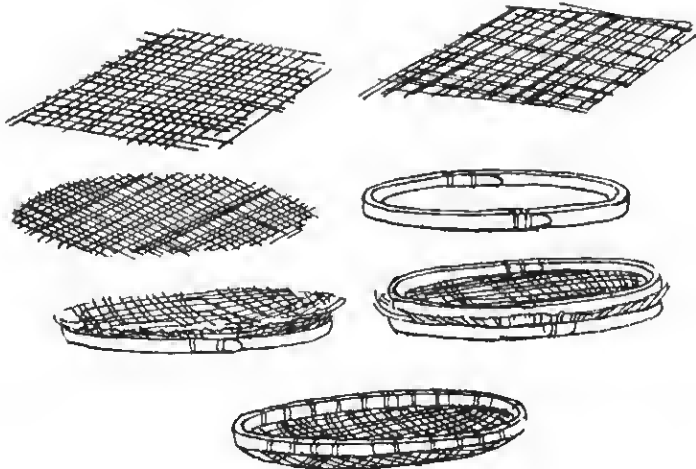


বাঁশের পাতি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার পদ্ধতি

পার্শ্ব: ৭, ৮ ও ৯

ভালা ও চালনি

ভালা ও চালনি তৈরির পদ্ধতি একই নকম। ভালার জন্য আধা ইঞ্চি চওড়া এবং চালনির জন্য এক সূতা বা দেড় সূতা চওড়া পাতলা বাঁশের পাতি নিই। পাতিগুলো হবে বিশ একুশ ইঞ্চি লম্বা। দুটো জিনিসই সাধারণত দুধারা পদ্ধতিতে বুনতে হবে। ভালা বুনতে হবে ঠাস বুননি দিয়ে, যেন কোনো ছিদ্র না থাকে আর চালনি বুনব পাতিতে, সরকার মতো ফাঁক রেখে। খেয়াল রাখব লম্বা-লম্বি ও আড়াআড়ি উভয় দিকে পাতিতে পাতিতে যেন সমান ফাঁক থাকে। বুনা শেষ হলে চাক বা ফ্রেম লাগাতে হবে। চাকের জন্য এক থেকে দেড় ইঞ্চি চওড়া, সাড়ে তিন হাত লম্বা পাতলা বাঁশের চটা নিয়ে ভালো করে ঠেছে বুকের দিকটা সমান করে নিই। প্রত্যেকটি ভালা বা চালানুর জন্য এরকম একজোড়া চটার প্রয়োজন। চটাগুলোর দুমুখা ছয় সাত ইঞ্চি জায়গা ঠেছে ক্রমে ক্রমে পাতলা করে দুই দিকে যথাসম্ভব পাতলা করে নিই। প্রত্যেকটি চটার এক মাথা পিঠের দিকে এবং অপর মাথা পেটের দিকে চাঁদতে হবে। চাঁদ শেষ হলে একটি চটার পিঠ বাইরের দিকে রেখে আস্তে আস্তে ঝিকিয়ে গোল করে নিই এবং এক হাত ব্যাস রেখে সরু করে চেরাগুলো বেত দিয়ে বেঁধে একটি চাক তৈরি করি। দ্বিতীয় চটার হুক বাইরের দিকে রেখে এভাবে আরো একটি চাক তৈরি করি। প্রথম চাকের চেয়ে দ্বিতীয় চাকের ব্যাস পোয়া ইঞ্চি কম হবে। ভালা অথবা চালনির বুনানো অংশটি যথাসম্ভব বড় রেখে গোল করে কাটি এবং চারদিকে সমান জায়গা রেখে বড় চাকের উপর বসিয়ে তাতে চেপে চাকের ভেতর কিছুটা নমিয়ে নিই। এবার ছোট চাকটি বড় চাকের ঠিক মাঝখানে এবং চেপে দেওয়া বুনানো অংশের উপর বসিয়ে জোরে চেপে চেপে বসিয়ে নিই। ছোট চাক বসাবার সময় খেয়াল রাখব এর জোড়া যেন বাইরের বড় চাকের জোড়ার উল্টো দিকে পড়ে।

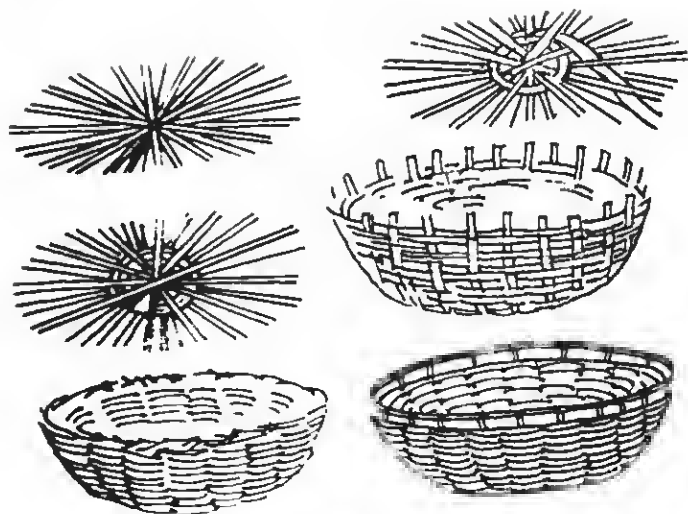


ডালা ও চালানি তৈরি করার পদ্ধতি

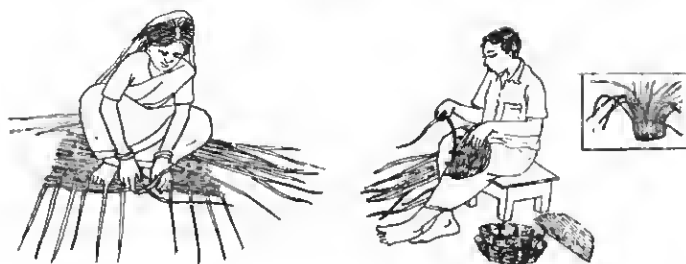
ছোট চাক বড় চাকের তেতর মোটামুটিভাবে বসে গেলে চাকের উপরে বেরিয়ে থাকা বুননের বাড়তি অংশ ধারালো ছুরি দিয়ে বড় চাকের সমান করে কাটি এবং চেপে চেপে চাক দুটির মুখ সমান করে নিই। তিতরের চাকের বাঁধন কেটে দেই যাতে চাকটি প্রসারিত হয়ে বাইরের চাকের সাথে ঠেলে বসে যায়। চাক দুটির মুখের মাঝামাঝি ঠাঁকের উপর বাঁশের সরু একটি বেতি বসিয়ে বুননসহ চাক দুটিকে সরু করে চেঁরা জালি বেত দিয়ে ক্রমান্বয়ে বেঁধে শেষ করে দেব। এবার আমরা যে কোনো মাগের ডালা, চালানি কিংবা এ ধরনের যে কোনো জিনিস তৈরি করতে পারব। গ্রামে অনেকেই খুব সুন্দর সুন্দর ডালা ও চালানি তৈরি করতে পারে। সুযোগ পেলেই আমরা তাঁদের কাজ দেখে নেব, তাহলে বিষয়টি বুঝতে আরো সহজ হবে। জিনিসগুলো ছোট আকারে তৈরি করে আমরা খেলনা বা শখের জিনিস হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

ঝুড়ি

ঝুড়ির জন্য পাতি ও বেতি দুটোই ব্যবহার করতে হয়। আগেই জেনেছি, পাতি হয় চ্যাণ্টা ও পাতলা আর বেতি হয় লম্বা সরু পাতির চেয়ে গুরু। কমপক্ষে আধা ইঞ্চি চওড়া ও হাত তিনেক লম্বা বেশ কিছু পাতি নিয়ে নিচের ছবির অনুকরণে বুকের মতো করে বসাই। সবগুলো পাতির মাঝামাঝি জায়গাটা যেন কেন্দ্রে পড়ে। এবার লম্বা বেতি দিয়ে কেন্দ্রে বুকের আকারে বুনো যাই। একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে— একসাথে দুটি বেতি নিয়ে বুনন আরম্ভ করতে হবে। ছবিতে লক্ষ করি প্রথম বেতি যে পাতির নিচ থেকে উপরে উঠছে বিপরীত বেতি তার পাশের পাতির নিচ থেকে উপরে উঠছে। বুনার সময় কেন্দ্রে থেকে চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া পাতিগুলোকে প্রতিবারেই একটু একটু করে উপর দিকে টেনে দেব যেন বুনন একেবারে সমতল না হয়ে পরিস্থিতির দিকে আসতে আসতে উপরে উঠতে থাকে।



বাঁশের পাতি দিয়ে বৃদ্ধি তৈরি করার পদ্ধতি



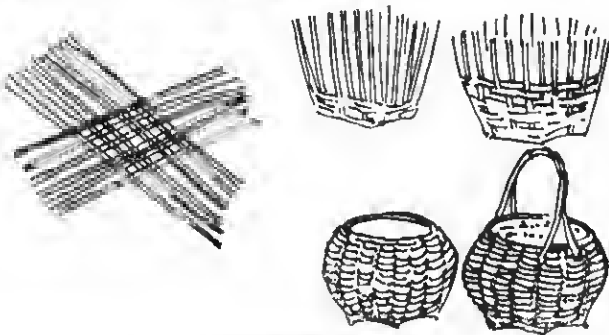
বাঁশের চাটাই ও বৃদ্ধি তৈরি

বুনানো অংশের ব্যাল আট নয় ইঞ্চি হয়ে গেলে আরো কিছু পাতি নিয়ে আগের পাতিগুলোর কাঁকে কাঁকে আগের মতোই বৃত্তের আকারে বসাই এবং সমতলভাবে বেতি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনো যাই। কয়েক লাইন বুনার পর সম্পূর্ণ জিনিসটি উলটিয়ে বসাই এবং পাতিগুলো উপরের দিকে টেনে টেনে বেতি দিয়ে বৃত্তাকারে বুনো যাই। খেয়াল রাখব বুনন যেন

সমতল না হয়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে শেষ পর্যায়ে খাড়া হয়ে উঠে। এবার খাড়া হয়ে যাওয়া পতিগুলোর দুই ইঞ্চির মতো বাড়তি রেখে বুনন শেষ করে দিই। পাতির বাড়তি অংশ ঝাঁক করে ঝুড়ির পরিধির সাথে সমান্তরালভাবে পেঁচিয়ে বেঁধে নিই। ইঞ্চি খানেক চওড়া ও প্রয়োজনমতো লম্বা দুটি বাঁশের চটা নিয়ে টেঁছে ছিলে চাকের জন্য তৈরি করি। এখন বুকের দিকে মুখোমুখি করে ঝুড়ির বাইরে ভেতরে বসিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিই। এই পদ্ধতিতে জামরা ছোট ছোট খেলনা ঝুড়িও তৈরি করতে পারি, তবে তার জন্য বেতি, পাতি, চটা সব কিছুই সরু ও পাতলা হতে হবে যাতে খেলনা ঝুড়ির আকারের সাথে খাপ খায়।

বালাই

বালাই তৈরির জন্য প্রায় আধা ইঞ্চি চওড়া ও দুই হাত লম্বা পাতি ও লম্বা সরু বেতির প্রয়োজন। নিচে ছবির মতো পাতিগুলির মাঝে পোয়া ইঞ্চি করে যাঁক রেখে সাত আট ইঞ্চি চওড়া করে লম্বালম্বিভাবে বসাই। ঐ একই পাতি আড়াআড়িভাবে ব্যবহার করে লম্বালম্বি পাতির মাঝখানটায় বুনে যাই। বুনানো অংশ লম্বা চওড়ায় সমান হয়ে গেলে এই বুনন শেষ করি। এবার এক ছোড়া লম্বা বেতি নিই। বুনানো অংশের এক কোণো থেকে বেতির এক প্রান্ত দিয়ে ঝুড়ির বুননের মতো বা দিক থেকে ডান দিকে বুনতে আরম্ভ করি। বুনন দ্বিতীয় কোণ পর্যন্ত পৌঁছে গেলে সম্পূর্ণ জিনিসটি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে বসাই। বাঁয়ের অংশটি উপরের দিকে টেনে তুলে নিয়ে বেতিগুলো ঘুরিয়ে সামনের অংশ বুনে জোরে টেনে নিই। এবার বাঁ দিকের কোণে সামনের ও বাঁয়ের পাতি দুটির শিতের দিকে লম্বালম্বিভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনে নিই এবং প্রত্যেকটি কোণের পাতিগুলোকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিই। দুই দিন লাইন টেনে বুনান পর আর টালবনা, এবার থেকে বাইরের দিকে সামান্য ঠেলে ঠেলে পর পর প্রসারিত করে বুনে যাই।



বাঁশের পাতি দিয়ে বালাই তৈরির করার পদ্ধতি

খেয়াগ রাখব বুননের সময় খাড়া পাতিগুলোর মধ্যেকার যাঁক যেন সমান থাকে। খাড়া পাতির মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে উঠার পর বুননের সময় বেতি একটি টেনে বালাইর মুখের দিকে ক্রমশ ছোট করে বুনি। পাতি দু ইঞ্চি বাড়তি রেখে বুনন শেষ করি। পাতির বাড়তি অংশটুকু মুখের সমান্তরালভাবে ভেতরের দিকে ঝাঁক করে সরু বেতি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধি। খালাই মোটামুটি তৈরি হলো। এবার আধ ইঞ্চি চওড়া ও একলম্ব বাঁশের চটা নিয়ে খালাইর মুখের মাশে একটি চাক তৈরি করে উপরের দিকে বসিয়ে সুন্দর করে বেঁধে নিই।

বাঁকি রইল হাতল। লম্বা, মাঝারি ধরনের যেটা একই মাপের দুই বৃত্ত জালি বেত নিই। একই পাশ থেকে হিসে প্রত্যেকটির দুই মাথা আধা ফালি করে নিয়ে ছবির মতো ঝলইতে লাগিয়ে সরু চেরা বেত দিয়ে সুন্দর করে বেঁধে নিলেই ঝালই তৈরি শেষ হলো। দৈনন্দিন জীবনে ঝালই যেমন ব্যবহার হয় তেমনি শব্দের জিনিস হিসেবে ছোট ছোট ঝালই তৈরি করে ঘরে রাখতে পারি।

পার্শ্ব: ১০, ১১ ও ১২

মূর্তা ও বেতের কাজ

মূর্তা ও বেত আমাদের দেশে সব জায়গায় পাওয়া যায়। কোথাও কম কোথাও বেশি। সিলেট, জুমিগ্রা, নেয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় মূর্তা ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই এসব স্থানে পাটি, মূর্তার ও বেতের তৈরি চাটাই এবং নকশা করা মাদুরও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। সিলেটের পাটি দেশে বিদেশে বিখ্যাত।

মূর্তার ব্যবহার উপযোগী অণাটি সাধারণত পাঁচ ছয় হুট লম্বা। এর মধ্যে কোনো গিট থাকে না। উপরিভাগ শক্ত মসৃণ, কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ। ভেতরের অংশ সাদা ও শেঁটার মতো নরম। মূর্তার উপরের শক্ত ও মসৃণ অংশটুকু কাজে লাগে, নরম অংশ ফেলে দিতে হয়। পাটি, মাদুর, চাটাই কিংবা অন্যান্য যেকোনো জিনিস তৈরি করতে গেলেই মূর্তা এবং বেত ছিলে পাতি তৈরি করে নেব। ছোট বড় বিবেচনা করে প্রথমে মূর্তা ও বেতকে লম্বালম্বি চার থেকে আট ফালি করে চিরে নেব। বুকের নরম অণাটি সাবধানে চেঁছে ফেলে দিব, যেন বুকের সাথে পিঠের শক্ত অংশ কাটা না পড়ে।

এই অবস্থায় পাতি যথেষ্ট পুরু রয়েছে এবং বুকের সাদা নরম জিনিসটি আংশিকভাবে থেকে গিয়েছে। এবার বাঁশের একটি ঝুরির সাথে পেঁচিয়ে বুকের দিক উপরে রেখে পুরু পাতিগুলোকে আগাগোড়া টেনে নিই যাতে বুকের দিকটা কেটে গিয়ে মসৃণ পিঠের দিকটা সমতল হয়ে যায়।

এভাবে পাতিগুলোর বুক ফাটানো ও পিঠ সমতল হয়ে গেলে বুকের দিকটা আবার ভালো করে চেঁছে নিই। পেঁচি পাতিগুলো বেশ পাতলা হয়ে গেছে। প্রয়োজনবোধে আবার লম্বালম্বিভাবে চিরে সবু করে দেব। চাটাই ও মাদুরের জন্য এই পর্বারের পাতি ব্যবহার করা হয় কিন্তু পাটির জন্য আরো সূক্ষ্ম পাতির প্রয়োজন। ভালো পাটি তৈরির উপযোগী পাতি তৈরি করা শিবতে দীর্ঘদিনের অভ্যাসস্বাদের প্রয়োজন। পাতি তৈরি করার পর দুই তিন দিন পানিতে ডুবিয়ে রেখে আবার একটু শুকিয়ে নিয়ে কাজে লাগাব। মাদুর ও পাটিতে বুনে নকশা করার জন্য রঙিন পাতি ব্যবহার করতে হয়। মূর্তার মসৃণ পিঠের দিকে রং ধরতে চাননা যে পাতিতে রং করব তা চেরার আশে মূর্তার পিঠের মসৃণ স্তরটা খুব হালকাভাবে চেঁছে নেব। পাকা রং পানিতে গুলে পাতিগুলো কয়েক ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে রং করব। পাটি অথবা মাদুরের জন্য সাধারণত লাগের সাথে সামান্য সবুজ মিশিয়ে যেহীন রং ব্যবহার করা হয়। মূর্তা ও বেতের পাতি তৈরি ও রং করার কথা জ্ঞানলাম। এবার কয়েকটি জিনিস তৈরি করি। প্রথমে চাটাই দিয়েই আরম্ভ করি।

চাটাই

মূর্তার চাটাই শোয়া, বসা, বিছানার নিচে পাতা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। শহরবাসীদের মধ্যে এই চাটাইর ব্যবহার বেশি না থাকলেও গ্রামে-গঞ্জে, মফসসে এটা দুবই প্রচলিত। একটু চেষ্টা করলে আমরা চাটাই তৈরি করতে পারব।

চাটাই ছোট ও হতে পারে আবার বড়ও হতে পারে। এর জন্য আয়তনের অনুপাতে প্রয়োজনীয় লম্বা ও আধা ইঞ্চির মতো

চণ্ডা পাতি নেব। বুননের সময় প্রয়োজনবোধে পাতির মখার উপর নতুন পাতি বসিয়ে জোড়া দিয়ে আরো লম্বা করতে পারি। মূর্তির পাতি একটু চণ্ডা হলে সাধারণত তার গায়ে লম্বালম্বি থাকে। যাতে চাটাই মোলায়েম হয় ও দেখতে ভালো লাগে। সুধারা পশ্চতিতে চাটাই বুনতে হয়। চতুর্দিকে দেড় থেকে দুই ইঞ্চি পাতি বাড়তি রেখে বুন শেষ করি। এবার পাতির বাড়তি অংশ নিচের সিকে একটি একটি করে ঝাঁক সরা করে চেরা পাতি বেত দিয়ে বেঁধে নেব। একে চাটাইর মুড়ি বঁধা বলে। উপরে ছবিতে মুড়ি বঁধার পশ্চতি দেখে নিই। বঁধানোর বেত কীভাবে চালাতে হবে খুব ভালো করে লক্ষ করি।

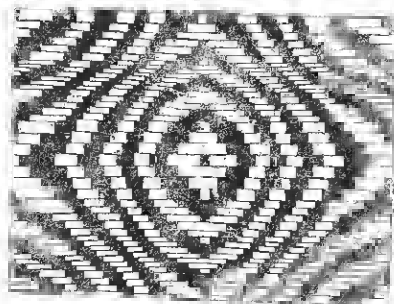
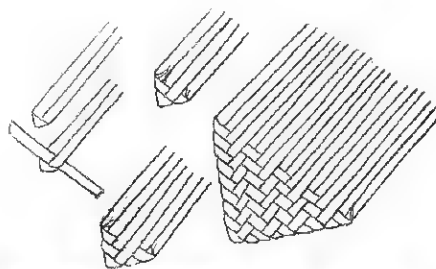
মাদুর

চাটাই তৈরি শেখার পর মাদুরে হাত দিই। মাদুর সাধারণত শোয়া ও বসার জন্য ব্যবহার করা হয়। নকশা করা সুন্দর সুন্দর মাদুর জায়নামাঙ্ক হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। ঘর সাজানোর জন্য সুন্দর নকশা করা মাদুর আছকাল শহরবাসীদের সমাদর লাভ করেছে। মাদুরের জন্য দেড় সূতা পরিমাণ চণ্ডা পাতলা পাতির প্রয়োজন। বুন নকশা করার জন্য রঙিন পাতিও লাগবে। রং ছাড়া পাতি লম্বালম্বিভাবে সাজিয়ে রঙিন পাতি আড়াআড়ি বসিয়ে নকশার প্রয়োজনমতো এক ধারা, দুধারা, তেধারা ইত্যাদি পশ্চতি মিলিয়ে বুনো যাই। বুন শেষ হলে মুড়ি বঁধার পশ্চতিতে মুড়ি বেঁধে নিই। চাটাইর মুড়ি বঁধার জন্য যে বেতের ফালি ও সরা বেত ব্যবহার করেছি, মাদুরের জন্য তার চাইতে সরা ফালি ও বেত ব্যবহার করব। এবার আমরা আমাদের জন্য ছোট বড় মাদুর তৈরি করতে পারব।

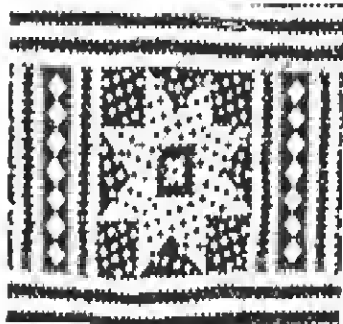
পাতি

মূর্তির তৈরি জিনিসের মধ্যে পাটির কদর সবচেয়ে বেশি। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বিছানার উপর পেতে শোয়া খুবই আরামদায়ক। এতে গরম কম লাগে বলে পাটিকে শীতলপাটিও বলা হয়। ভালো পাতি বিশেষ করে সুন্দর নকশা করা পাটিও তার জন্য সূক্ষ্ম পাতলা পাতি তৈরি করতে বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও উচ্চমানের কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন। এখন আমাদের পক্ষে এক কাজ করা কঠিন। তবুও অতি সাধারণ পাতি বুনার পশ্চতি সম্পর্কে সামান্য ধারণা নিয়ে রাখছি।

শেখার জন্য মাদুর তৈরির উপযোগী পাতি দিয়ে পাতি বুন'র চেষ্টা করতে পারি। পাতি বুনতে চাটাই বা মাদুরের মতো লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে আলাদা আলাদা পাতি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। বুননও লম্বা বা চণ্ডার দিক থেকে আরম্ভ করতে হয় না। পাতির বুন আরম্ভ হয়ে এক কোণ থেকে এক একই পাতি ঝাঁক হয়ে আড়াআড়ি থেকে লম্বালম্বি পাবার প্রয়োজনবোধে লম্বালম্বি থেকে আড়াআড়িভাবে চলে যায়। এতে পাটির চারদিকে বাড়তি পাতি থাকে না, আপনা থেকেই মুড়ি বন্ধ হয়ে যায়, চাটাই বা মাদুরের মতো মুড়ি বঁধার প্রয়োজন হয় না। প্রথমে একটি পাতি নিয়ে ছবিতে দেখানো নিয়মে ঝাঁক করি। আরেকটি পাতি নিয়ে ছবি দেখে প্রথমে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে দুদিক ঝাঁক করে লম্বালম্বি সিকে নিয়ে যাই। ঝাঁক করার সময় লক্ষ রাখবে পাতির পিঠি যেন সব সময় উপরের সিকে থাকে। তার জন্য দুধার ঘুরিয়ে ঝাঁক করতে হবে। এবার তৃতীয় পাতি নিয়ে অনুবৃত্ত ভাবে বুনো যাই। সাধারণ পাতির বুনন হয়ে দুধারা পশ্চতিতে। এভাবে একের পর এক পাতি বসিয়ে বুনো যাই। একটা জিনিস খেয়াল করি এ পর্যন্ত বুননের সময় পাতি প্রথমে আড়াআড়ি বসিয়ে ঝাঁক করে লম্বালম্বি করা হয়েছে। বুননের সাথে সাথে পাটির লম্বা ও চণ্ডা দুটিকেই সমানভাবে বাড়ছে। পাতি চণ্ডার চেয়ে লম্বা বেশি হয়। পাতি প্রয়োজনমতো চণ্ডা হয়ে গেলে এবার লম্বালম্বি পাতি ঝাঁক করে আড়াআড়ি করব। আবার প্রয়োজনবোধে আড়াআড়ি থেকে লম্বালম্বি করব। পাতির লম্বার সিকের একপাশ প্রয়োজনমতো লম্বা হয়ে গেলে পাতি ঝাঁক করে বুনো বাকি অংশটা শেষ করব।



চাটাই তৈরি করার প্রাথমিক পর্যায়



নকশা করা পাটি

পাঠ : ১৩, ১৪ ও ১৫

টাই ও ডাই

উপকরণ : কাপড়, সুতা, জালপিন, সেকটিপিন, নুড়ি, খিপি, বোভাম, ধান, সোডা (কাপড় কাচার), লবণ, চা চামচ, বড় চামচ, রং, বেল বা বাটি, গুঁড়ো মাগাবার নিক্তি, কেরোসিন স্টেভ, কাপড় খোবার চাড়ি বা ডাবর, বালতি, বাটিক ফাস্ট কালার, ডাইলন রং, ইসিরা ইত্যাদি।

টাই ও ডাই প্রণালিতে প্রস্তুত মনোমূল্যবান কারুশিল্প বস্তু শতাব্দী পূর্ব থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। প্রতিকর্ষক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই পদ্ধতিতে কাপড়ের মধ্যে রং লাগিয়ে আকার, রূপ, রং ও নকশা সৃষ্টির যারা এমন মনোরম কারুশিল্প সৃষ্টি করা যায় না। আধুনিক জীবনের জটিলতাজনিত টানাগোড়নের হাত থেকে নিশ্চুতি লাভের জন্য মানুষ ক্রমশই সৃজনশীল গৃহ নৈপুণ্যের দিকে ঝুঁকি নিয়েছে এবং সেই হেতু কখন ও রঞ্জন প্রণালির কারুশিল্প বিশেষভাবে ভাব সজারী আবেদন সৃষ্টি করেছে, কারণ এটি একটি সুন্দর শিল্প। এই প্রণালিতে প্রস্তুত কারুশিল্প আকর্ষণীয়তায় এবং ব্যবহারযোগ্যতায় অনন্য। ‘কখন-রঞ্জন’ প্রণালিতে রঞ্জিত কাপড় বা চিত্তাকর্ষণ ও মনোহরণে অগুণ্ণ, তা দিয়ে কাপড়, গলাকর্ষ, রুমাল, রুমাল গুঁড়না, চাদর কুলন, পর্দা বিছানার চাদর, টেবিলের কাপড় ইত্যাদি হরেক রকম গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করা যায়। ‘কখন ও রঞ্জন’ প্রকৃত অর্থে এটাই বুঝিয়ে থাকে। কাপড়কে বাধা হয়। ভাঁজ করা হয়। সেলাই করা হয়, পেরো দেওয়া হয় অথবা অন্যভাবে আবদ্ধ করা হয়, যাতে করে কাপড়ের সম্পূর্ণ অংশ রঞ্জন পাঠে ডুবলে ভাঁজ করা অংশ রং প্রবেশ করতে না পারে এবং রঞ্জিত ও অ-রঞ্জিত কাপড় মিলে একটি সুন্দর এবং বর্ণালী নকশার সৃষ্টি হতে পারে। ‘কাটিকে’ কাপড়ের অংশ বিশেষ রং থেকে মুক্ত রাখার জন্য মোম ঘারা স্বেপন করা হয়। প্রতিকর্ষকতা সৃষ্টির যারা রঞ্জন করার প্রতিটি পদ্ধতি বৈচিত্র্যময় নকশা, সহজ বা জটিল কারুশিল্পকে অসীম সুযোগ এনে দেয়। কখন ও রঞ্জন এবং বাটিক ফাস্ট কালার (বাটিক রং) প্রুশিয়ান রং ও ইন্ডিগো রং ব্যবহৃত হয়, তা ছাড়া ‘ডাইলন কোল্ড ওয়াটার ডাই’ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়; কারণ এতে কাপড়ের রং পূর্ণরূপে পাকা হয়, বহুবার লঙ্ঘিতে ধোয়ানো হলেও রঙের উজ্জ্বলতা হ্রাস পায় না।

বাটিকের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

১। একটা মসৃণ সমতল কাঠের টেবিল। (একে ট্রেসিং টেবিল বলা হয়)

টেবিলের মাণ অনুসারে কাঠের টুকরা উপরে থাকবে।

২। মোমের কাজ করার জন্য একটা কাঠের মসৃণ এবং সমতল টেবিল দরকার। এটি যেন বররের কাগজ বা শক্ত হার্ডবোর্ড দিয়ে ঢাকা থাকে। এররকম টেবিলে মোমের কাজ করা ভালো।

৩। গ্যাসের/কেরোসিনের চুটি (স্টেভ)।

৪। এলুমিনিয়াম বা হাতলমুক্ত পাত্র।

৫। রজন (Resin) এবং চাক মোম (মৌচাকের মোম)।

৬। ব্লক এবং ব্রাশ (মোট, চিকন)।

৭। একটা কাঠের তৈরি ফ্রেম। এর সাহায্যে নকশাতে মোম লাগাতে সুবিধা হবে। তার আগে কাপড়কে ফ্রেমে আটকাতে হবে। (কাজ করার সময় সতর্ক হবে কাজ করা দরকার)।

- ৮। কাপড়ের নকশা আকার জন্য পেনসিল, কার্বন কাগজ এবং মাঝারি শক্ত পেনসিল।
- ৯। বাসতি বা টব। (এনামেল বা প্রাস্টিকের)।
- ১০। রং মেশাবার জন্য ছোট আকারের স্ট্রিগের পাত্র বা প্রাস্টিকের গামলা।
- ১১। মেজারিং সিলিন্ডার (মাপার যন্ত্র)। এর সাহায্যে তরল পদার্থকে মিমি. ও লিটারে মাপা যায়। (কাচ বা প্রাস্টিকের তৈরি)।
- ১২। রাবার বা প্রাস্টিকের শীট।
- ১৩। হাতের গ্লাভস বা সস্তানা। (এটি পাতলা রাবারের তৈরি)
- ১৪। পুরাতন খবরের কাগজ। (কাছ করার জায়গা ঢাকার জন্য)
- ১৫। বড় এবং ছোট আকারের প্রাস্টিকের চামড়া।
- ১৬। বাটিক প্রিন্টের জন্য উপযুক্ত ধবধবে সাদা সুতি কাপড়।

বাটিকের কাজ

এ কাজে ব্যবহৃত সাবস্ট্রেটসমূহ বুইই সুলত ও সাধারণ। রঞ্জন ক্রিয়া জ্বালাগোড়া ঠান্ডা পানিতেই সম্পন্ন করা হয়, তবে আলাগা রং উঠিয়ে ফেলার জন্য সবশেষে পাঁচ মিনিটের জন্য ফুটন্ত পানিতে ছুঁিয়ে রাখতে হয়।

কখন ও রঞ্জনের পর কাপড় ভালোভাবে দুইয়ে ভালো করে ইস্ত্রি করতে হবে। পেনসিল দিয়ে নকশা একে নিতে হবে, নমুনাটি সুই-সুতা দিয়ে বখেয়া ঝেঁড় দিয়ে সুতা টেনে ঝেঁড়তে হবে, রং করতে হবে, দুইয়ে নিতে হবে। অথবা নকশা ছাড়াও সাধারণভাবে বেঁধে নিলেও হবে। এছাড়া বিভিন্ন কৌটার মুখ বা অন্যান্য জিনিস ভিতরে ঝাঁধা যায়।

রং করার পদ্ধতি:

১ টিন রং=১০ গ্রাম, ১/৩ আউন্স অথবা ২ বড় চামচ চামচ; ৪ বড় চামচ লবণ=আনুমানিক ১১২ গ্রাম অথবা ৪ আউন্স; ১ বড় চামচ সোডা= আনুমানিক ৪২ গ্রাম অথবা ১.৫ আউন্স।

উল্লিখিত জিনিস ২০ আউন্স পরিমাণ তরল রং তৈরি করতে হবে। সন্ধ্যা এবং অধিক পরিমাণের জন্য রং, লবণ ও সোডা উপরে বর্ণিত অনুপাতে নিতে হবে। ১ টিন রং এক পাউন্ড পানিতে দ্রবণ করতে হবে। নাড়াচাড়া করতে হবে। ৪ বড় চামচ সাধারণ লবণ এবং ১ বড় চামচ সাধারণ সোডা এক পাউন্ড গরম পানিতে দ্রবণ করতে হবে নাড়াচাড়ার মাধ্যমে ঠান্ডা করতে হবে। যখন নমুনা প্রস্তুত হবে, কিন্তু তার আগে নয়, সলিউশন দুটি মিশ্রণ করতে নমুনাটি ভিজানো এবং ১.৫ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত রং করতে হবে। প্রথম ১০ মিনিট নাড়াচাড়া করা এবং এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। প্রথম ১০ মিনিট নাড়াচাড়া করা এবং এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। বৈশি রং প্রবেশের জন্য অথবা ভারী নানুনার জন্য রঞ্জন পাত্রে শুকানো অবস্থায় শুকাতে হবে।

যখন রং করা শেষ হবে, তখন নমুনাটি পাত্র থেকে উঠিয়ে ফেলতে হবে এবং পানি না শুকানো পর্যন্ত টিপড়তে হবে। ফুটন্ত পানিতে নমুনাটি ঢেকে রাখতে হবে (সিঁচ এবং উত্তপ্ত পানি গরম পানি) মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে হবে; এইভাবে পাঁচ মিনিট রাখতে হবে। উত্তমরূপে পানি দ্বারা পরিষ্কার করা এবং শুকানো, একত্রিত করে এবং পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। যখন নমুনা একত্রিত হবে যায়, তখন দ্বিতীয়বার গরম পানিতে ধৌত করা উত্তম। শেষবার ধৌত

করার পর নমুনাটি ইন্সট্র করতে হবে, তাতে তাঁদের দাগ এবং অর্জুতা দূর হয়ে যাবে। বিতীয় রঙে রঞ্জিত করতে হবে পয়েন্টে বাঁধতে হবে। পয়েন্ট পূর্ণ বন্ধন করে এইভাবে সজ্জিত করতে হবে যেন বাঁধানোর বাইরের অংশ প্রয়োজনীয় রঙে রঞ্জিত হতে পারে। বিতীয় রঙের জন্যও রঞ্জন প্রক্রিয়া একইভাবে করতে হবে। নমুনাটিকে একত্রিত করার জন্য গোরো বাঁধার সূতা কেটে ফেলতে হবে।

একবার সোডা মিশ্রণ করলে রবট ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। রং যদি প্রয়োজনের কিছু পূর্বে মিশ্রণ করতে হয়, তবে রঙের সলিউশন এবং লবণ ও সোডার সলিউশন দুটি অলাদাপাত্রে রাখতে হবে। তারপর প্রত্যেকটি সমপরিমাণে মিশ্রণ করতে হবে। ছিপি খুব এঁটে লাগালে এই রং বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। ডাইসন কোল্ড ওয়াটার ডাই কাপড়, লিশেন, ভিসকোল, রেয়ন, সিল্ক এবং উপের জন্য আদর্শ রঞ্জক।

বন্ধন ও রঞ্জনের কলাকৌশল

গ্রন্থি বা গোরো পরীক্ষার জন্য একটি গ্রন্থি বাঁধতে হবে দেখতে হবে এতে কতটুকু কাপড় লাগে, গ্রন্থির অবস্থা চিহ্নিত করতে হবে।

১নং প্রণালি : একটি কাপড় লম্বালম্বিভাবে অর্ধেক করে ভাঁজ করতে হবে, এটি পাক দিতে হবে এবং প্রথম চিহ্নিত স্থানে একটি গ্রন্থি বাঁধতে হবে। প্রদর্শিত গ্রন্থির ন্যায় ফাঁক ফাঁক করে গ্রন্থিগুলো বাঁধতে হবে।

২নং প্রণালি : কাপড়ের একটি সমান্তর নির্দিষ্ট অংশ ভুলতে হবে, এটি পাক দিতে হবে এবং একটি গ্রন্থি বাঁধতে হবে। নমুনার পরিকল্পিত স্থানে আবার ঐরূপ করতে হবে। যদি কাপড়ের আয়তক্ষেত্রের মধ্যভাগে গ্রন্থিটি বাঁধা হয়, তবে প্রত্যেক কোণে অন্য গ্রন্থিগুলো বাঁধতে হবে।

সকল প্রণালির জন্য : গ্রন্থিগুলো এঁটে বাঁধতে হবে এবং প্রথম রবট দিতে হবে পুনরায় গ্রন্থিগুলো বাঁধতে হবে এবং বিতীয় রবট দিতে হবে। পরে পানি ঘারা পরিষ্কার করতে হবে। গরম পানিতে ধুয়ে শুকাতে হবে। স্ফূঁ ঘুরানোর ন্যায় গ্রন্থিগুলো প্রত্যেক পার্শ্ব পাকিয়ে একত্রিত করতে হবে। গ্রন্থিগুলো তখন একত্রিত করার পক্ষে বেশ আলাপা ও সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। পরে ধুয়ে শুকাতে হবে।

সকল প্রকার বাঁধনের জন্য শক্ত সূতা, নাইলন সূতা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। লম্বালম্বিভাবে কাপড় ভেঙে ভাঁজ করা অথবা ভাঁজ করতে হবে। সূতার এক পার্শ্বে গোরো দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরপর সরু বাঁধন দিতে হবে। চোরার উপর শক্ত বাঁধন দিতে হবে। ভাড়াভাড়ি বেঁধে বা উপরোক্ত তিন প্রকারের মিশ্রণ গোরো বেঁধে, শক্ত করে বাঁধতে হবে এবং রং করতে হবে। রং করার পূর্বে আরও রং যোগ করা যায় অথবা গ্রন্থি পরিবর্তন করা যায়।

চক্ষুস্পর্শ : এক গ্রন্থি মিহি কাপড় চার ভাঁজ করে তারপর তাকে একটি ত্রিভুজাকারের রূপ দিতে হবে। সবগুলো বেঁধে পরে রং করতে হবে।

মার্বেল রং : ছোট নমুনা নিয়ে কাপড় হতে গুচ্ছ করতে হবে। সূতার গ্রন্থি বাঁধতে হয়ে। একটি শক্ত বর তৈরি করার জন্য এটিকে সব স্থানে বাঁধতে হবে।

টেবিলের উপর কাপড় সটান করে রাখতে হবে। কাপড়ের এগাশে ওগাশে কাজ করে এবং কাপড়ের নির্দিষ্ট অংশ ফাঁক করে গোলাকৃতি করতে হবে যাতে করে পাড়ে ভাঁজ পড়ে। কাজ করার সময় একটি আলগা বাঁধন দিতে হবে। যখন সমস্ত কাপড় গুচ্ছাকৃতি হয়ে যায় তখন একটি শক্ত গুচ্ছ তৈরির জন্য আরও বাঁধন লাগাতে হবে উভয় প্রণালির জন্য।

প্রথমে রবট দিয়ে ধুরে ফেলাতে হবে এবং একত্রিত করতে হবে। কাপড় পুনরায় বিনাস্ত করে বাঁধতে হবে এবং দ্বিতীয় রং লাগাতে হবে।

একতাল কাপড় বন্ধন

ছোট ছোট জিনিস যেমন মুড়ি, ছিপি, বোতাম, ধান ইত্যাদি কাপড় গ্রন্থিত করা যায়। এদের অবস্থান পেনসিলের সাহায্যে 'ডট' দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। প্রথম 'ডটে' কোনো একটি জিনিস কাপড়ের ভেতর রেখে এবং এর চারপাশে সূতা দিয়ে বাঁধতে হবে। সূতাটিকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে এবং পরবর্তী 'ডট' কেও যথাস্থানে বাঁধতে হবে।

এর উপর একটি আলগা গ্রন্থি বাঁধতে হবে। এপাশে তপাশে কাজ করার সময় প্রত্যেকটি জিনিস এইভাবে বাঁধতে হবে অথবা মধ্যভাগ থেকে বহির্ভাগের দিকে বাঁধতে হবে।

পরিবর্তন : কখন-স্থান এক টুকরো 'পলিথিন' দিয়ে ঢেকে ডবল করে বাঁধতে হবে। একটির উপর আর একটি বাঁধতে হবে। জিনিসটিকে ঢেকে একটি বোপার মতো করে উপরের দিকে বাঁধতে হবে। পরে রং দিতে হবে।

বৃত্ত কাপড়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ দিতে হবে। একটি ছোট বৃত্তের জন্য কাপড়ের নির্দিষ্ট অংশে সূতা ছাড়া বেঁধে অপেক্ষাকৃত বড় একটি বৃত্তের জন্য আরও সামনের দিকে অনুরূপভাবে বাঁধতে হবে। নির্দিষ্টস্থানে ডিজাইনের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁধন দিতে হবে। বাঁধন দৃঢ় করে পরে রং করতে হবে। অন্য রং দেয়ার পূর্বে বাঁধন পরিবর্তন অথবা অন্য বাঁধন যোগ করা যেতে পারে।

ডিম্বাকৃতি এবং অসমকোণী ত্রিভুজ

আকৃতির মধ্যভাগ বরাবর কাপড় ভাঁজ করে ভাঁজের বিপরীতে অর্ধেক ডিম্বাকৃতি এবং অসমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করতে হবে। পেনসিলের লাইন বরাবর 'সেফটিপিন' দ্বারা বুনন করতে হবে। পিন আটকানো, পিনের নিচে সূতা দিয়ে বাঁধানো পিন সরিয়ে ফেলাতে হবে। প্রয়োজনমতো পাখার আকৃতি বিশিষ্ট নমুনা বেঁধে দৃঢ় করতে হবে। প্রত্যেক আকৃতির জন্য এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। পরে রং লাগাতে হবে। অন্য রং দেয়ার পূর্বে বাঁধন পরিবর্তন অথবা অন্য বাঁধন যোগ করা যেতে পারে।

পাঠ: ১৬ ও ১৭

বাটিক

উপকরণ : ট্রেসিং পেন্সার, জলরং জুলি (নং ২ ও ৩), স্টোয়ার্ড কাপড়, তেলরঙের জুলি (নং ৪ ও ৮) লাল ও সাদা মোম, লবণ, সোডা (কাপড় কাচা), এলজিনেট (গুড়া জাতীয় অর্থাৎ), কাপড় ফিটকারী, সোডিয়াম নাইট্রেট, সালফিউরিক এসিড, মনোফল সপ, কস্টিক সোডা নেপথল রং (বাটিক রং), ফাস্ট কালার (বাটিক রং), গুণিয়ান রং, ইন্ডিগো রং ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ নতুন কাপড় প্রথমে ব্যবহার করার পূর্বে সাবান দিয়ে ধুয়ে ইস্তিহ করা একান্ত প্রয়োজন।

বাটিক সৃষ্টিশীল কাজের অন্যতম মাধ্যম। এর ইতিহাস বা উৎস সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা মুশকিল। তবে বাটিকের উৎপত্তি সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে, এর প্রচলন প্রাচ্য দেশসমূহে বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার জাভা, বালি ও তৎসলব্দ দেশসমূহে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। বর্তমানে এ সকল দেশে বাটিকশিল্প এক গৌরবময় ঐতিহ্যের সূচনা করেছে এবং ভক্তজন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ সকল দেশ হতে বাটিকশিল্প ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে অনেক দেশে বাটিক কাজ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশেও বাটিকের কাজ বর্তমানে

বেশ দেখা যায় দেশের সর্বত্রই এর প্রচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেউ কেউ উন্নয়ন প্রকল্পের গবেষণায় বাটিক কাজ করে যাচ্ছেন। আর কেউবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই শিল্পকে ব্যবহার করছেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে বাটিক কাজ দুটি পদ্ধতিতে করা হয়, যথা- (১) Nephthol color (২) Procion color (reactive dyes)

প্রথমে বাটিক উপযোগী নকশা অঙ্কন করে পরে ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে নকশা কাপড়ে উঠাতে হয়।

নেপথল রং করার প্রণালি : বাটিক কাজ করার পদ্ধতিতে ধারাবাহিক পাঁচটি স্তর রয়েছে। তা জেনে নিই।



মোম বাটিকের ছবি

প্রথম স্তর : প্রথম পর্যায় নকশা অনুযায়ী কাপড়টিতে যেখানে রং ব্যবহার করা হবে সে অংশটুকু ছাড়া বাকি অংশে 'মোম-গরম করে তুলি দিয়ে নকশার স্থান কাপড়ের উভয় পার্শ্বে লাগাতে হবে (সেভাবেতঃ কাপড়ে মোমে আবৃত করা স্থানে রং লাগবে না)। রং করার পূর্বে ১০-১৫ মিনিট পর্যন্ত কাপড়টি ভিজিয়ে নেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় স্তর : নকশা করা কাপড়টি রং মিশ্রিত পানিতে প্রথমে প্রথম পাত্রে ও পরে দ্বিতীয় পাত্রে ২-৩ মিনিট রাখার পর একই প্রক্রিয়ায় বার বার চুবাতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় চুবাতে রং পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।

তৃতীয় স্তর : নকশা অনুযায়ী রং করার পর পুনরায় অন্য রঙের ব্যবহারের জন্য ও এই রঙটি রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে মোম দ্বারা একই পদ্ধতিতে কাপড় আবৃত করে পাত্রে চুবাতে হবে। মনে রাখতে হবে একই প্রক্রিয়ায় বারবার পাত্র পরিবর্তন করে চুবানো হয়। এভাবে কাপড়ে অনেক প্রকার রঙের ব্যবহার করা যায়।

চতুর্থ স্তর : কাপড়টি রোদহীন ঠাণ্ডা জায়গা একটানা ১২ ঘণ্টা ছায়ায় শুকাতে হবে।

শুধুমাত্র Base color এর কাজ করার সময় দ্বিতীয় পাত্র পরিবর্তন করতে হবে। যেমন—

বিশদণ পানিতে।

(ক) ফিটকারী—৬৫

(খ) সোডিয়াম নাইট্রেট—৩%

(গ) সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4)

অথবা হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCL)=3%

(ঘ) Fast Red KB-3%

Fast color খাটিক রঙের বিভিন্ন নামকরণ রয়েছে। যেমন- Fast color = Red KB, কেবল Nephthol-AS এর বেলায় প্রযোজ্য। কোনো ন্যাপথল, ব্রেনথল ইত্যাদির সাথে কোনো Salt বা Base যোগ করলে কী কী রং পাওয়া যায়, নিচের চার্টে তা ফেনে নিই।

লাল=Naphthol	As+Fast Red Salt GL
লাল=Naphthol	As+Scarlet Salt GG
লাল=Naphthol	As-Fast Scarlet R
লাল=Naphthol	As+BS+Fast Red Salt R
লাল=Naphthol	As-TR+Fast Red Salt TR
লাল=Naphthol	As-BO+Fast Red Scarlet Salt R
লাল=Naphthol	As-RL+Fast Red Scarlet Salt R
লাল=Branthol	As+Fast Red KB Base
লাল=Branthol	As+Fast Red Scarlet R Base
লাল=Branthol	MN+Fast Red Scarlet G Base
লাল=Branthol	BN+Fast Red Scarlet G Base
লাল=Branthol	BN+Fast Red Scarlet R Base
লাল=Branthol	BN+Fast Red KB Base
লাল=Branthol	CT+Fast Red Scarlet G Base
লাল=Branthol	CT+Fast Red Red KB Base
কমলা=Naphthol	AS+Fast Orange Salt GC Base
কমলা=Naphthol	AS+Fast Orange Salt GR Base

কমলা =Branthol	AS+Branthol fast Yellow GC
লাল=Branthol	AS+Branthol fast Orange GC Base
লাল=Branthol	AS+Fast Orange GR Base
লাল=Branthol	MN+Fast Orange GC Base
লাল=Branthol	CT+Fast Orange GC Base A
খয়েরি= Napthol	AS-BO + Napthol Red Salt B
খয়েরি= Napthol	AS + Napthol Garnet GBC Salt
খয়েরি= Napthol	AS + Bardo Salt GP Salt
খয়েরি= Branthol	AS + Branthol Bardo CP Base
খয়েরি= Branthol	AS + Branthol Fast garnet GBC Base
খয়েরি= Branthol	MN + Branthol Fast Garnnet GBC Base
খয়েরি= Branthol	AN + Branthol Fast Garnnet GBC Base
খয়েরি= Branthol	AN + Branthol Fast Bardo GP Base
খয়েরি= Branthol	BN + Branthol Fast Bardo GP Base
খয়েরি= Branthol	BN + Branthol Fast Bardo GBC Base
নীল = Branthol	AS + Branthol Fast Blue Salt B
নীল = Branthol	AN + Branthol Fast Blue Salt B
নীল = Branthol	BN + Branthol Fast Blue Salt B
নীল = Napthol	AS + Fast Blue Salt BB
নীল = Napthol	AS + Fast Blue Salt BR
নীল = Napthol	AS-TR + Fast Blue Salt BR
নীল = Napthol	AS-OL + Fast Blue Salt BB
হালুদ = Napthol	AS-G + Fast Yellow Salt GC
হালুদ = Napthol	AS-G + Scarlet Salt GC
হালুদ = Branthol	AT+Branthol Yellow GC Base

ব্রেনথল ও ন্যাপথলের সমতুল্য তালিকা

Branthol AS=Napthol AS

Branthol MN=Napthol AS-BS

Branthol AN=Napthol AS-BO

Branthol PA=Napthol AS-RL

Branthol NG=Napthol AS-GR

Branthol BT=Napthol AS-BL

Branthol RB=Napthol AS-SR

Branthol FR=Napthol AS-OL

Branthol GT=Napthol AS-TR

Branthol DA=Napthol AS-BS

Branthol FD=Napthol AS-RG

Branthol AT=Napthol AS-G

Branthol BN=Napthol AS-SW

প্রশিয়ান রং করার প্রণালি : এই পদ্ধতিটি Nephthol color process এরই অনুরূপ। তবে মোম তৈরিকরণ একটু ভিন্ন ধরনের। যথা-সাদামোম ৪ ভাগ+রজন ২ ভাগ+ লাল মোম ১ ভাগ একত্রিত করে ব্যবহার করব।

Procion Color Process-এর রং করা পদ্ধতি : প্রথম পায়ে প্রয়োজনানুসারে রং (Procion) ও লবণ ৩০% ভাগ অল্প পানিতে মিশ্রিত করব। দ্বিতীয় পায়ে ২০ গুণ পানিতে প্রথম পায়ের প্রস্তুত রং মিশ্রিত করে ভেজা কাপড়টি আধঘণ্টা নাড়চাড়া করব। অতঃপর কাপড়টি উঠিয়ে ৮% ভাগ সোডা (কাপড় কাচা) মিশিয়ে পুনরায় রং করা কাপড়টি আধঘণ্টা নাড়চাড়া করব, এরপর ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে ২৪ ঘণ্টা ছায়ায় শুকাতে দিব। শুকনো কাপড়টি অতঃপর ভিজিয়ে ফুটন্ত পানিতে ৪-৫ মিনিট নাড়ালে মোমগুলো পৃথক হয়ে যাবে।

প্রয়োজনানুসারে কাপড় রং করতে হলে-

হালকা রং এর জন্য ১ তোলা থেকে ২ তোলা

মাঝারি রং এর জন্য ২ তোলা থেকে ৩ তোলা

গাঢ় রং এর জন্য ৩ তোলা থেকে ৪ তোলা

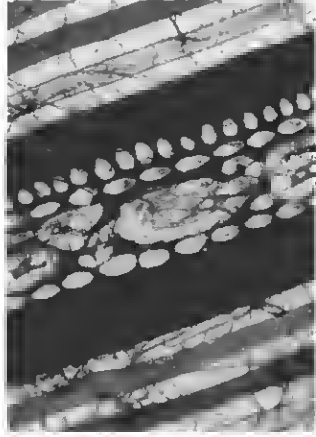
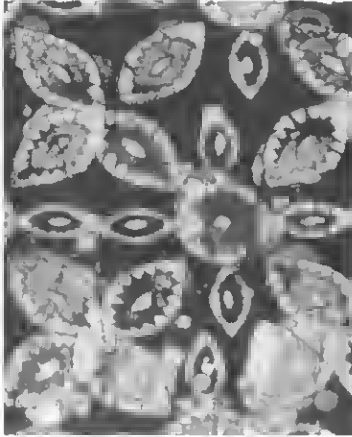
বিঃদ্রঃ ১০০ তোলা কাপড়ের ওজন নে।

প্রশিয়ান রঙের তালিকা : Blue M₂R, Blue M₃R, Red M₈B, Red M₅B, Yellow M₆G, Orange M₂R ইত্যাদি।

Nephthol অথবা Procion color পদ্ধতি ছাড়াও ব্যটিক প্রিন্ট কাপড়টিতে নকশা অনুযায়ী সবুজ, নীল বা বেগুনি রং রাখতে হলে Cold Dying করার পূর্বে যেখানে যে রং ব্যবহার করা হয়, তা Pigment process এ করা হয়ে থাকে।

Pigment Process পদ্ধতি : বাজারে Indigo color বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এক গজ কাপড়ের Pigment Process এর রং করতে হলে Indigo color সিকি তোলা নিতে হবে। ১/৪ ছটাক পানি ফুটিয়ে গরম অবস্থায় দু'আনা (১/৮ তোলা) সোডিয়াম নাইট্রেট মিশাতে হবে। পরে সিকি তোলা রং সোডিয়াম নাইট্রেট মিশ্রিত পানিতে ঠান্ডা করতে হবে অন্যদিকে আঠা Alginate (গুঁড়া জাতীয় আঠা) কুসুম গরম পানিতে ৫ মিনিট মিশালে আঠায় পরিণত হবে। অতঃপর প্রস্তুত Alginate আঠা ঠান্ডা রঙে মিশাতে হবে।

নকশা করা কাপড়টি প্রয়োজন অনুসারে ৯নং তুলি ব্যবহার করার মতো) প্রস্তুত রং তুলি দিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এভাবে বিভিন্ন ধরনের 'Indigo Color' নকশা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতঃপর রং করা কাপড়টি ২/১ চা চামচে সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত পানিতে নাড়ালে Indigo color এর প্রকৃত রং বেরিয়ে আসবে। এই পদ্ধতিকে 'Pigment Process' বলে।



ব্যটিক প্রিন্টে ছাপা কাপড়

কাপড় ছাপা

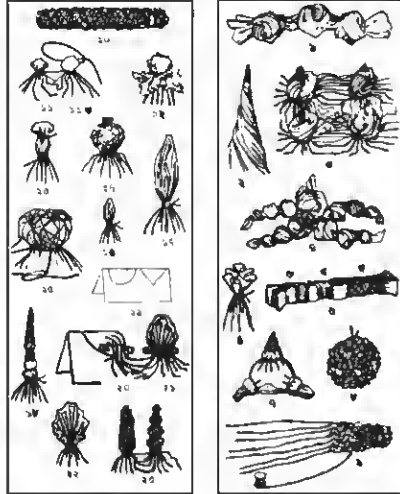
ছাপা কাপড় আমরা সবাই কমবেশি ব্যবহার করি। আমাদের পাঞ্জাবি, জামা, বিছানার চাদর, শাড়ি, ফ্রক, ওড়না ইত্যাদি রং-বেরঙের ছাপা কাপড় দিয়ে তৈরি করে থাকি। কাপড় ছাপার পদ্ধতি জানা থাকলে আমরা নিজেরাই আমাদের পছন্দমতো কাপড় ছেপে ব্যবহার করতে পারি।

ছাপার আগে কাপড়কে উপযোগী করে নিতে হবে, নইলে ভালো ছাপা বা রং ধরবে না। কোড়া কাপড় বা মাড় দেয়া কাপড়ে ভালোভাবে রং ধরে না। তাই কোড়া কাপড়ের ওলনের ১০ গুণ পানি নিয়ে প্রতি ১০ শিটের পানিতে ২ তোলা সাবান, ২ তোলা কাপড় কাচা সোডা ও ৩ তোলা কস্টিক সোডা ২/৩ ঘণ্টা সিঁখ করে প্রথমে গরম ও পরে ঠান্ডা পানিতে ভালো করে ধুয়ে নেব। খোসাই করা কাপড় যেনে শুধু সাবান পানিতে ১৫/২০ মিনিট সিঁখ করে ভালো করে ধুয়ে নিলেই কাপড় ছাপার জন্য তৈরি হয়ে গেল। এবার ছাপার পদ্ধতির কথা জানাব—

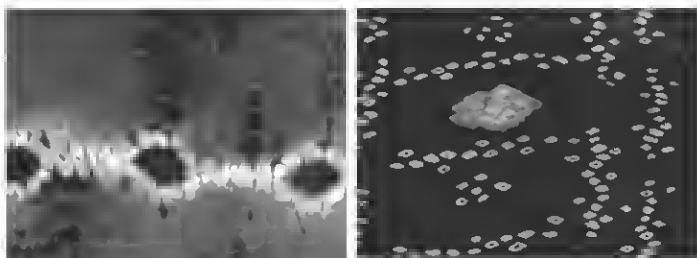
টাই এন্ড ডাই

সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে অর্ধ আকর্ষণীয় কাপড় ছাপার জন্য টাই এন্ড ডাই করা হয়। নামটা ইংরেজি। এর বাংলা করলে হবে বাঁধা এবং রং করা। আমরা বহুল প্রচলিত টাই এন্ড ডাই নামটাই ব্যবহার করব। এ পদ্ধতিতে কাপড় বাঁধার জন্য শক্ত সুতা ও রং করার প্রয়োজনীয় জিনিস রাখব। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কাপড়ের নির্দিষ্ট স্থানে সুতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রঙে ছুঁবিয়ে অথবা রং ঢেলে নিলেই হবে। বাঁধা ছায়াগায় রং না লেগে এক ধরনের নকশার সৃষ্টি হবে। নির্দিষ্ট কোনো নকশা না হলেও অত্যন্ত আকর্ষণীয় নকশার সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট নকশা করার জন্য সুই সুতার সাহায্য নেব। শাড়ি, শুল্কি অথবা অন্য কোনো কাপড়ে পরিমিত আকারে বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত, কর্ণিক, ফুল পাতা বা অন্য কোনো নকশা কাপড়ে ঝুঁকে নেব। এবার বাঁধা সেলাইয়ের ফোড় দিয়ে পার্শ্ব রেখা বরাবর সেলাই করে এবং সুতার দুই প্রান্ত আন্তে আন্তে টেনে নকশার ভেতরের কাপড় লম্বা করে টেনে নেব। সেলাই পর্যন্ত সুতা দিয়ে গেঁড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে নেব। বাঁধার সময় কিছু ছায়াগা ঝাঁক থাকলে ভালো হয়। এভাবে সব কটি নকশা বেঁধে নিতে হবে। তারপর রঙে ছুঁবিয়ে নিয়ে নেড়েচড়ে নিলেই হলো। একবার বেঁধে রঙে ছুঁবালে এক রং, এমনভাবে একাধিক রঙের জন্য কয়েকবার বেঁধে রঙে জোবাতে হবে। প্রত্যেকবার বাঁধার আগে কাপড় ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নেব। একাধিক রং করার সময় হালকা রং থেকে শুরু করব।

এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোনো নকশা ছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে বাঁধার মাধ্যমে আকর্ষণীয় ও বৃটিসম্বন্ধভাবে কাপড় ছাপানো যায়। এই পদ্ধতিতে কিছু বাঁধার নমুনার ছবি দেখে নিই।



টাইডাই করার পদ্ধতি

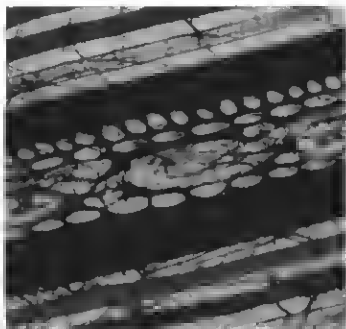
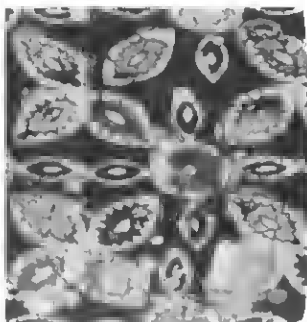


কাপড়ে করা টাই এন্ড ডাই

মোম বাটিক

উপকরণ : এই পদ্ধতিতে কাপড়ে নকশা করার নিয়ম অনেকটা টাই এন্ড ডাই পদ্ধতির মতো। অর্থাৎ নকশায় রং লাগতে না দিয়ে সমস্ত কাপড়ে রং লাগতে দেয়া। নকশায় যাতে রং লাগতে না পারে তার জন্য বিশেষ মোম দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এভাবে বিভিন্ন রং করে শাড়ি, ব্লাউজ, বিছানার চাদর, পর্দা, জামার কাপড়, ওড়না ইত্যাদি নকশা করা যায়।

এই পদ্ধতিতে সুন্দর ছবিও করতে পারি। যাকে বাটিকের ছবি বলে। এক রঙের বাটিক করতে সরাসরি কাপড়ের উপর পেনসিলে ড্রইং করে সেভাবে মোম লাগিয়ে রং করলেই চলবে। কিন্তু একাধিক রং হলে কাপড়ে রঙিন নকশা ঐকে নেব এবং পর্যায়ক্রমে মোম করব। কার্বন কাপজের সাহায্যে কাপড়ে নকশাগুলো ঐকে নিয়ে কাপড়ের সাদা অংশের দুপিঠেই মোম দিয়ে ঢেকে দিব। প্রথমে হলুদ রঙে চুবিয়ে ভালো করে রং করে নিই, তারপর ঠান্ডা পানিতে সামান্য ধুয়ে শুকিয়ে আবার হলুদ নকশার অংশ মোম দিয়ে ঢেকে দিব। এরপর পূর্বের মতো রঙে চুবিয়ে শুকিয়ে নিই এবং পরবর্তী হালকা রঙের অংশ মোম দিয়ে ঢেকে দেই। সবশেষে গাঢ় বা কালো রং করতে হবে।



মোম বাটিকের কাজ

বাটিকের কাছে সব সময় ঠান্ডা রং ব্যবহার করতে হয়। টাই এন্ড ডাই এর মতো বাটিকের জন্য একই নিয়মে রং করতে হয়। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে রং তৈরির শিখন পদ্ধতি শিখে নিই।

এবারে বাটিকের মোম তৈরির পদ্ধতি জেনে নিই। বাটিকের কাজের জন্য বিভিন্ন অনুপাতে দুই ধরনের মোম এবং রজন ব্যবহার করা হয়। গ্রুশিয়ান রং দিয়ে বাটিক করার সময় কাপড় বেশিক্ষণ পানিতে ছুবিয়ে রাখব, তা না হলে ব্যবহৃত মোম ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই রজন কিছুটা বেশি মেশাব।

মোম তৈরির অনুপাত জেনে নিই—

গ্রুশিয়ান রঙের উপযোগী মোম

১। প্যারামিন বা সাপা মোম আনুপাতিক হারে—৫০%

২। মৌচাকের মোম —২৫%

৩। রজন — ২৫%

পিতল বা এলুমিনিয়ামের পাত্রে ছলার খুব কম আঁচে মোম গলাতে হবে। রজন, মোম গলে ভালোভাবে মিশে গেলে ছলার আঁচ আরো কমিয়ে দিব। ছলার উপর রেখে নকশা করা কাপড়ে গোলকঙ্গাওয়ালা খালয় কাপড় লাগিয়ে মোম লাগাতে সুবিধা। ছবি দেখে করি।

মোম লাগানো শেষ হলে গ্রুশিয়ান বা ভ্যাট রঙে ছুবিয়ে রং করতে হবে। অধিক রঙের কাপড় আলতোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে তারপর পরবর্তী মোম ও রং করব। এভাবে রং করা শেষ হলে কাপড় থেকে মোম তোলার জন্য একটা পাত্রে প্রয়োজনমতো গুঁড়ো সাবান দিয়ে কাপড়খানি সিঁধ করে মোম ছাড়িয়ে নেব। মোম ছাড়িয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ইস্ত্রি করে নিলেই মোম বাটিক হয়ে পেল।

কাপড়ের রং তৈরি

কাপড়ের রং করার নিয়মগুলো জানা প্রয়োজন। মোটামুটি তিনটি পদ্ধতির রং বাটিকে ব্যবহার করা যায়।

১। ভেট রং

২। গ্রুশিয়ান রং

৩। ন্যাফথল রং

ন্যাফথল রং ব্যবহার একটু জটিল বিধায় শুধু ভেট রং ও গ্রুশিয়ান রঙের পদ্ধতি জেনে নিই।

ভেট রং

একখানা শাট্রি বা সমপরিমাণ কাপড় রং করার জন্য নিচের পরিমাণে রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন—

ভেট রং = ১ তোলা

হাইড্রোসালফাইট এন এক = ৪ তোলা

কস্টিক সোডা = ৪ তোলা

রং করার আগে কাপড় কমপক্ষে ৩০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখব। এরপর পানি বরিয়ে নেব। পরে কাপড়ের পরিমাণে পাত্রে পানি দিয়ে তা হুগায় বসাব। রং ও রাসায়নিক দ্রব্যগুলো নেড়েচেড়ে ভালো করে মেশাব। পানি গরম হলে রং সহ জিনিসগুলো ভালোভাবে মিশে গেলে ভেজা কাপড় এর মধ্যে দুবিয়ে ১৫/২০ মিনিট সিঁধ করব। কাপড় (টাই এন্ড ডাই)

বীধা অবস্থায় পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ফেলাতে হবে। ছায়ায় রেখে শুকানোর পর খুব ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ইস্ত্রি করব। ভেট রং গরম করতে হয় বিধায় টাই এন্ড ডাই পদ্ধতির জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গ্রুশিয়ান রং

একটি শাড়ি বা সমপরিমাণ কাপড়ের জন্য নিচের পরিমাণ রং, লবণ ও সোডার প্রয়োজন

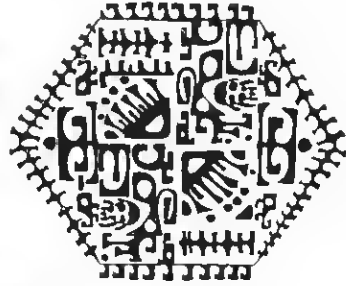
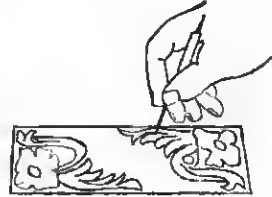
১। গ্রুশিয়ান রং = ১ তোলা ২। লবণ = ৫ তোলা ৩। কাপড় কাচার সোডা = ১ তোলা

রং বরার আধা ঘণ্টা পূর্বে কাপড় ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখব পরে কাপড়ের পরিমাণে পানিতে পরিমিত ১ তোলা লবণ মেশাব। এনামেলের পায়ে সামান্য গরম পানিতে ৩/৪ ফোঁটা এসিটিক এসিড দিয়ে গ্রুশিয়ান রং মেশাব। রং ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে লবণ মিশ্রিত পানিতে মিশিয়ে দিতে হবে এবং তাতে কাপড় ডুবিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দেখব যে কাপড়ের সর্বত্র রং লেগেছে কিনা। ত্রিশ মিনিট পর আরেকটি বাটিতে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে সোডাটুকু গুলে নিব এবং ডুবানো কাপড়ের রঙের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। সোডা মেশানোর পর আরো ত্রিশ মিনিট ডুবিয়ে রাখব। এরপর কাপড় তুলে নিয়ে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ছায়ায় শুকাব। ভালো করে শুকানোর পর সুতার বীধনগুলো খুলে নেব তারপর সাবান দিয়ে ধুয়ে ইস্ত্রি করব। যে বাটিক পদ্ধতিতে ঠান্ডা পানিতে রং করা হয় সে পদ্ধতি অনুসরণ করব।

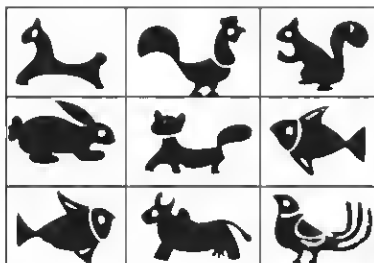
পাঠ : ১৮

ব্লক

কাঠে নকশা একে নুরন দিয়ে বোদাই করে করে ব্লক ছাপার জন্য ব্লক তৈরি করা হয়।



ব্লক প্রিন্টের নকশা



ব্রক পিট



কাঠের ব্রক

পাঠ : ১৯, ২০

কাঠ খোদাই শিল্প

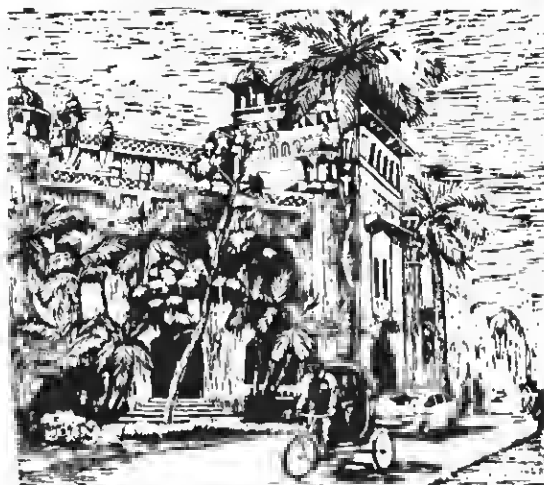
নরম কাঠের ভক্তার উপর অথবা প্রাইউড নকশা একে নুবুন দিয়ে খোদাই করে এটি তৈরি করতে হয়।

উপকরণ : হাতুড়ি, বাটালি/Carving বাটালি / Round বাটালি, প্রাস, করাড, চিকন বাটালি, শিরীষ কাগজ।



কাঠ খোদাই কৰে ছাপচিত্ৰ

শিল্পী : হুৰাইয়া জামান বুৰা



কাঠ খোদাই কৰে ছাপচিত্ৰ

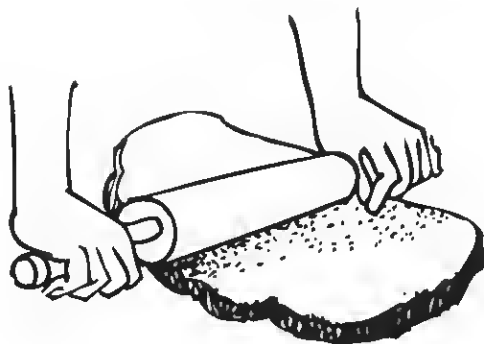
শিল্পী : সঞ্জীৱ কুমাৰ পাল

পাঠ : ২১ ও ২২

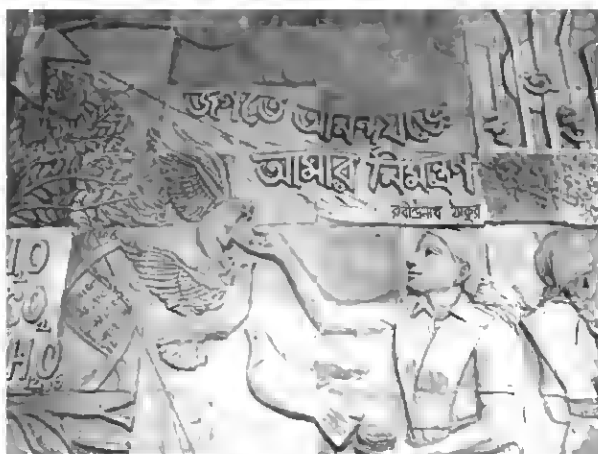
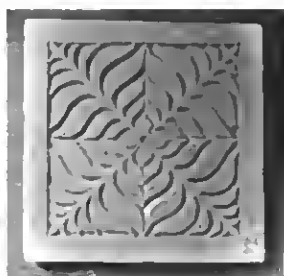
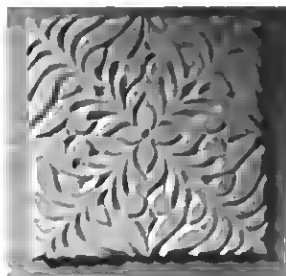
টেরাকোটা

পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা টেরাকোটা

পোড়ামাটির ফলকচিত্র বাংলাদেশের আদি ঐতিহ্যবাহী শোকশিল্প এবং খুবই বিখ্যাত। মধ্যযুগে বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনাত্তে বিশেষ করে মন্দির, মসজিদ ইত্যাদির দেয়ালে এ ফলকচিত্র ব্যবহার করা হতো। পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা Terracotta হচ্ছে মাটির পাটাতনের বা ফলকের সমান জমিনের উপর ছবি বা নকশা উঁচু হয়ে থাকে এমন রিলিফ ওয়াক। এটা বানানোর জন্যে প্রথমে কঁচা মাটি দিয়ে ফলকগুলো তৈরি করে তারপর পুড়িয়ে নেয়া হয়। তাই এগুলোকে বলে পোড়ামাটির ফলক। কুড়ার মহাস্থান গড়ে তথা প্রাচীন পুন্ড্রনগরীর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম ফলকচিত্র পাওয়া গেছে। মহাস্থানগড়ের এবং দিনাজপুরের কান্দিয়ার মন্দিরের ফলকচিত্রের বিষয়বস্তু নরনারী ও দেবদেবী। অন্যদিকে পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতির ফলকগুলোতে তৎকালীন সমাজ ও নিসর্গের ছবি পাওয়া যায়, বাঘা মসজিদের বা টাঙ্গাইলের মদিনা মসজিদের ফলকচিত্রের বিষয়বস্তুও ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা, কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিভিন্ন বিষয় ও আকৃতি নিয়ে টেরাকোটা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন অফিস ও বাসবাড়ির আন্তঃরীণ সাজসজ্জা ও ভবনের বাইরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এখন গ্রহণ টেরাকোটা ব্যবহার করা হচ্ছে। মাটির দ্বারা তৈরি করে তাতে মাটি কাটার বিভিন্ন আকৃতির টুলস দিয়ে খোদাই করে করে টেরাকোটা তৈরি করা হয়। মাটি দিয়ে তৈরি করে ছায়ায় রেখে কিছুদিন ভালোভাবে শুকতে হবে। এরপর জুবার আগুনে পোড়াতে হবে। অথবা যাদের বাড়ির পাশে কুমার বাড়ি আছে তারা কুমার বাড়ির চুল্লিতেও পোড়াতে পারবে। ছবি দেখে আমরা অতি সহজেই এগুলো বুঝতে ও করতে পারব।



মাটির দ্বারা (Slab) তৈরি করা



মার্টিন কলকটিকা (টেলিফোন)

পার্শ্ব : ২৩ ও ২৪

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

বিভিন্ন হাড়ি পাতিল ভাঙা টুকরা দিয়ে ছবি তৈরি

উপকরণ : ফেবিক অ্যাঁ, বিভিন্ন হাড়ি পাতিল এর ভাঙা টুকরা ইত্যাদি।

একটি প্রাইউড এর টুকরা নিই। 2B পেনসিল দিয়ে প্রাইউড এর উপর পছন্দমতো একটি ছবি আঁকি। এইবার প্রাইউড এ ফেবিক অ্যাঁ লাগাই। বিভিন্ন হাড়ি পাতিলের টুকরোগুলোর মধ্যেও ফেবিক অ্যাঁ লাগাব। এরপর টুকরাগুলো নকশা অনুসারে খুব সাবধানে বসাব। নকশার বাইরে যে অংশ আছে সেখানেও অন্য ধরনের টুকরোগুলো ফেবিক অ্যাঁ দিয়ে লাগাব। এভাবে অতি সহজেই ফেলনা জিনিস দিয়ে আমরা একটি মোজাইক ছবি তৈরি করতে পারি। (ছবি দেখে অনুশীলন করি)



হাড়ি-পাতিলের ভাঙা টুকরা দিয়ে
শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রতিকৃতি

নমুনা প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

অনুচ্ছেদটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (বীণ ও বেতের কাছ)

একটি প্রাইভেট টিভি চ্যানেল কর্তৃক সপাঠিত বৈশাখী উৎসব উদযাপনের জন্য তারা এক বিরাট মেলার আয়োজন করে। সেখানে নানাভাবে দিনটিকে পালন করা হচ্ছিল। বৈশাখ মাসকে নানাভাবে বরণ-করা হচ্ছিল। স্বপ্নিল ও শ্রেয়া তাদের মায়ের সাথে সেই মেলা দেখতে গেল। সেখানে তারা বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন জিনিসের স্টল দেখতে পেল। সেগুলোর মধ্যে যে জিনিসটি তাদের বেশি আকৃষ্ট করল তা হলো বীণ ও বেতের স্টল। তারা সেখানে বীণের ফুলদানি, ছাইদানি, চালান, ছোট ছোট ঘর সাজানোর খালই, পুতুল ইত্যাদি। তাছাড়াও বেতের শীতলপাটি, নকশিপাটি ইত্যাদি দেখল। ওদের কাছে এগুলো খুবই ভালো লাগল এবং মায়ের কাছে ব্যয়না করল ঐগুলো কেনার জন্য যাতে তারা ঘর সাজাতে পারে। মা তাদেরকে বীণের দুটি পুতুল, ফুলদানি, ছোট খালই কিনে দিল। এগুলো পেয়ে তারা মনের আনন্দে বাসায় ফিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে এগুলোর প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে।

১। স্বপ্নিগ ও শ্রেয়া কান সাখে মেলায় গিয়েছিল?

২। তারা বাণ ও বেতের কী কী জিনিস দেখল?

৩। স্বপ্নিগ ও শ্রেয়া বাণ ও বেতের জিনিস দিয়ে সাঙিয়ে কীভাবে ঘরকে সুন্দর করতে পারে? উদ্দীপকের ভিত্তিতে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

৪। "বালাদেশে এগুণের প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে"- কীভাবে এগুণের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়-তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

ব্যবহারিক (Activity)

১। বাণের একটি ফুটদানি তৈরি কর।

সৃজনশীল (কার্টের শিল্পকর্ম, টেরাকোটা)

রহিম ও রেজা একদিন তাদের বাবার কাছে বাঘনা ধরল তারা চান্দুকলায় যাবে। তারপর যেই কথা সেই কাজ। তাদের বাবা তাদেরকে চান্দুকলায় নিয়ে গেল। তারা সেখানে নানান ধরনের জিনিস দেখতে গেল। তারা সেখানে কার্টের ভাস্কর্য, শিল্পকর্ম, চিত্রকর্ম, উভকার্ভিং, পেইন্টিং, পাথরের ভাস্কর্য, টেরাকোটা, মোজাইক ছবি ইত্যাদি দেখল। রেজা খুবই অনুপ্রাণিত হলো এবং ভবিষ্যতে চান্দুকলায় পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করল। সবকিছু দেখে তারা ঘরে ফিরল।

১। রহিম ও রেজা তাদের বাবার সাথে কৈথায় গিয়েছিল?

২। তারা সেখানে কী কী দেখল?

৩। কাঠ দিয়ে কী কী তৈরি করা যায়? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৪। কাঠ দিয়ে একটি ছোট গুড়ুল তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দিন।

১। টাই এন্ড ডাই পদ্ধতিতে কাপড় ছাপাতে হলে নকশানুযায়ী প্রথমে—

ক. রং লাগাতে হয় খ. পানিতে ডোবাতে হয়

গ. মোম লাগাতে হয় ঘ. বেঁধে নিতে হয়

২। হলুদ, লাল, নীল এই তিন রঙের টাই এন্ড ডাই পদ্ধতিতে কাপড় ছাপাতে হলে প্রথমে ব্যবহার করতে হয়—

ক. লাল রং খ. কালো রং

গ. হলুদ রং ঘ. সবুজ রং

৩। মোম বাটিক পদ্ধতিতে রং করতে হয়

ক. রং বেশি গরম করে খ. ঠান্ডা রঙে ডুবিয়ে

গ. অল্প গরম করে ঘ. ফুটন্ত গরম রঙে

খিল কর

বাঁশ দিয়ে	কাপড় রং করা যায়
খুশিয়ান রং দিয়ে	গরম মোম লাগাতে হয়
টাইডাই করতে কাপড়	খুঁড়ি, বালাই তৈরি করা যায়
বাঁশের চটি বা শলা দিয়ে	ফুলদানি তৈরি করা যায়
বাটিক করতে কাপড়	সূতা দিয়ে বেঁধে নিতে হয়
বাঁশের অনেক সুন্দর	কাপড় একে নিতে হয়
মাটির ফলকের	রং থেকে মুক্ত রাখার জন্য মোম লাগাতে হয়
নকশা ট্রেসিং করে	সামগ্রী তৈরি করা যায়
বাটিকে কাপড়ের অংশ বিশেষ	মাটি দিয়ে
ভেট রং দিয়ে	ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়
টেরাকোট তৈরি হয়	কাপড় রং করা যায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১) কাপড় রং করার পূর্বে কীভাবে কাপড়কে রং করার উপযোগী করতে হয়?
- ২) টাই এন্ড ডাই এর সংকল্প গাণ্ডিত লেখ।
- ৩) মোম বাটিক কীভাবে করতে হয়?

ব্যবহারিক (Activity)

- ১) একটি মাটির ফলকচিত্র তৈরি কর।
- ২) টাইডাই গাণ্ডিতে একটি জামা তৈরি কর।

রঙিন ছবি



জলরঙে ফুলের ছবি : শিল্পী হুশেম খান



ଜଳରେ 'ହାନ୍ସ' ଅନୁଶୀଳନ, ମିଟି: ସୁମାର ଅବିକାଶୀ



ବିଜୟଦଶମୀ ପର୍ବ: ଏହିପରି— ଗୋଟିଏ ସିନାମୁଖିଆ ଗ୍ରାମ, ବରମ୍ଭା— ୧୫



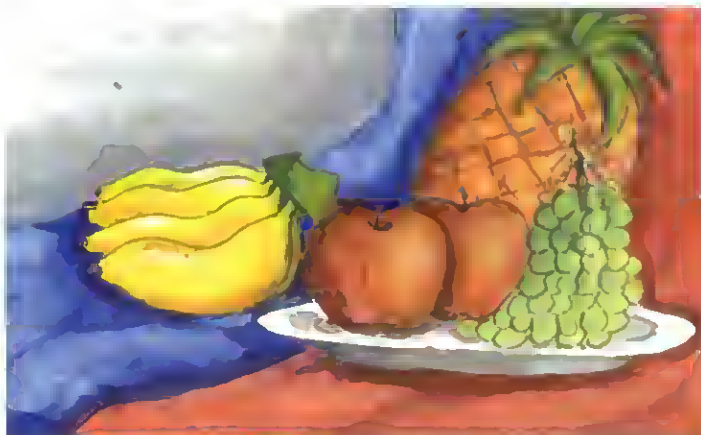
পোস্টার রং ও ছলনকে আঁকা 'আন্দোলন' ঐক্যে—তুকা দাশ পুস্তা বয়েল—১৪



ଉତ୍କଳରେ ଥିବା 'ନାମାର ଯୁଦ୍ଧ' ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ : ଆଳକେଶ୍ଵର ଦୁଆର



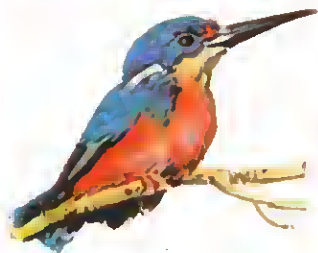
দৌকা ডেজি, কলকাতা মাধ্যমিক শিক্ষা, শিল্পী : আবদুল রাস্কাক, চন্দ্রকাম ৩য় বর্ষের ছাত্র-১৯৫১



জলরঙে 'শিরডিতা', একেছে: শ্রদ্ধা পেশিয়া পাটোয়ারী, বয়স-১৪



ছাতার ওপরে অ্যাক্রেলিক রঙে ছবিটি একেছে- অর্পিতা সাহা (বর্ণা)



শিল্পী হাশেম খানের অঁকা জলরং ও পেনসিল রঙে চিল, বাহাদুর মুরগি, মাছরাঙা, শালিক ও ঘুঘু

সমাপ্ত

২০১৭

শিক্ষাবর্ষ

৯-১০ চারু ও কারুকলা

নারী ও শিশু নির্ধাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেবায়
১০৯২১ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য